উন্নত চিন্তায় অর্থবিত্ত ও সফলতা অর্জন

থিংক অ্যান্ড গ্রো রিচ

নেপোলিয়ন হিল

অনুবাদ
অনীশ দাস অপু

নেপোলিয়ন হিল অত্যন্ত সফল একজন আমেরিকান লেখক। তাঁর জন্ম দক্ষিণ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পাউণ্ডে একটি অতি দরিদ্র পরিবারে। শৈশবেই তিনি তাঁর মাকে হারান। স্থানীয় সংবাদপত্রে মাউন্টেন রিপোর্টার হিসেবে তরুণ বয়সে কাজ শুরু করেন। টাকার অভাবে কলেজের পড়াশোনা তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়।

নেপোলিয়ন হিলের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট ছিল ১৯০৮ সাল, ওই বছর তিনি বিখ্যাত এবং সফল মানুষদের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করেন। তিনি শিল্পপতি এন্ড্রু কার্নেগির সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। ওই সময় কার্নেগি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী মানুষ। হিল আবিষ্কার করেন কার্নেগি সাফল্যের প্রতিক্রিয়ার ফর্মূলাটি খুবই সহজ-সরল এবং এটি যে কেউ বুঝতে পারবে ও অর্জন করতে পারবে। হিলের সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়ে কার্নেগি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হিল ৫০০ সফল নারী-পরুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে, যাদের মধ্যে অনেকেই কোটিপতি, তাদের সাফল্যের রহস্য জেনে তা প্রকাশ করতে পারবেন কিনা? গবেষণার অংশ হিসেবে হিল এ সময়ে বহু বিখ্যাত মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে ছিলেন টমাস আলভা এডিসন, আলেকজানডার গ্রাহাম বেল, জর্জ ইন্টিম্যান, হেনরি ফোর্ড, এলমার গেইস, জন ডি রকফেলার সিনিয়র, চার্লস এম সোয়াব, এফ.ডব্ল, উলওয়ার্থ, উইলিয়াম রিগলি জুনিয়র, জন ওয়ানামেকার, উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, থিওডর রুজভেল্ট, উইলিয়াম এইচ ট্যাফট, জেনিংস র‍্যানডলফ প্রমুখ।

কার্নেগির ইন্ট্রোডাকশনে হিলের বিশ্লেষণাত্মক এই লেখাগুলো ১৯২৮ সালে মাল্টি ভল্যুম স্টাডি কোর্স The Law of Success-এ প্রকাশিত হয়। হিল পরবর্তীতে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ Think and Grow Rich বের করেন যা সর্বকালের সেরা বেস্টসেলারের অন্যতম বলে বিবেচিত। হিলের এ কাজে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের শক্তির জায়গাটি এবং এগুলো ব্যক্তিগত সাফল্যে কী ভূমিকা রাখছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি ১৯৩১-৩৬ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ফ্রাংলিন ডি রুজভেলেটের উপদেষ্টা ছিলেন।

বর্তমানের সাফল্যের দর্শনের শিক্ষকরা এখনো হিলের শেখানো গবেষণামূলক ফর্মূলাগুলো তাঁদের ছাত্রদের ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করেন। নেপোলিয়ন হিল ৮৭ বছর বয়সে দক্ষিণ ক্যারোলাইন শহরে You can work your own miracles বইয়ের কাজ করার সময় মৃত্যুবরণ করেন। বইটি ১৯৭১ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

সর্বকালের সেরা বেস্ট সেলার

উন্নত চিন্তায় অর্থবিত্ত ও সফলতা অর্জন

থিংক অ্যান্ড গ্রো রিচ

নেপোলিয়ন হিল

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

থিংক অ্যান্ড গ্রো রিচ
নেপোলিয়ন হিল
অনুবাদ : অনীশ দাস অপু
(আত্মউন্নয়ন)

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৬
২য় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৩য় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৭

প্রচ্ছদ
শুভ্র অনির্বাণ

প্রকাশক
জাবেদ ইমন
মুক্তদেশ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১২৬৭১৩৪৬, ০১৬৭৫৪১৭৫৬৪
ই-মেইল : muktodesh71gmail.com
গল্পের বারান্দা golper baranda.facebook.com.

অক্ষর বিন্যাস : ইমন কম্পিউটার, ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ : মুক্তদেশ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড প্যাকেজিং লিঃ, ২২৭-১ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

ঘরে বসে মুক্তদেশ প্রকাশনের সকল বই কিনতে ভিজিট করুন–
http: rokomari.com/muktodesh

আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউ ইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

ISBN : 978-984-92644-20=0

THIINK AND GROW RICH by Nepolion Hill. Translated by Anish Das Apu. Published by, Jabed Emon. Muktodesh Prokashon, Islami Tower (2nd Floor), 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh. Date of 3rd Publication: Octobor 2017, Price : Tk. 250.00, U. S. A. 10 .only.

অনুবাদকের উৎসর্গ

জাবেদ ইমন

আত্ম-উন্নয়নমূলক বইয়ের প্রতি ইদানিং তার ঝোঁক আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করছি। আশা করা যায় এ ধরনের বই প্রকাশে তার উৎসাহ অব্যাহত থাকবে।

লেখকের ভূমিকা

এ বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে টাকা তৈরির যে গোপন কথা বলা হয়েছে তা পাঁচ শতাধিকেরও বেশি মানুষকে ধনবান করেছে। এ মানুষগুলোকে আমি দীর্ঘসময় ধরে পর্যবেক্ষণ করেছি।

এ সিক্রেটটি আমার মনোযোগ কাড়ে এন্ড্রু কার্নেগি দ্বারা, সিকি শতাব্দীরও আগে। প্রিয়দর্শন বুড়ো স্কটম্যানটি আমার মস্তিষ্কে অজান্তেই প্রবেশ করে যান, তখন আমি বালক মাত্র। তিনি তখন তাঁর চেয়ারে বসেছিলেন, ঝিকমিক করছিল চোখ, আমাকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করছিলেন দেখতে যে তিনি আমাকে যা বলেছেন তার গুরুত্ব বুঝবার মতো যথেষ্ট মগজ আমার রয়েছে কিনা?

তিনি যখন দেখলেন আমি তাঁর আইডিয়াটি ধারণ করতে পেরেছি, জানতে চাইলেন কুড়ি বছর কিংবা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারব কিনা সেই জগত এবং সেই বাগ্মী পুরুষদের মাঝে প্রবেশ করার জন্য, যারা কোনরকম সিক্রেট ছাড়াই ব্যর্থতার মাঝ দিয়ে চালিত করেছেন জীবন। আমি বললাম আমি পারব এবং মি. কার্নেগির সহায়তায় আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলাম।

এ বইতে সেই সিক্রেট বা গোপনীয়তার কথা রয়েছে যেখানে সহস্রাধিক মানুষের প্রাকটিক্যাল টেস্ট গ্রহণ করা হয়েছে, জীবনের প্রতিটি দিক ছুঁয়ে দেখা হয়েছে। এটি ছিল মি. কার্নেগির আইডিয়া, সেই ম্যাজিক ফর্মূলা যা তাকে অপরিসীম ধনসম্পদ দিয়েছে, তিনি সেইসব লোকের কাছাকাছি গেছেন যাদের অনুসন্ধান করার সময় নেই যে লোকে কীভাবে অর্থ বানায়, এবং তাঁর আশা ছিল আমি ফর্মুলাটি নারী-পুরুষের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরীক্ষা করতে সক্ষম হবো। এ ফর্মুলার গভীরতা বা সম্পূর্ণতা হাতে কলমে দেখিয়ে দিতে পারব।

কার্নেগি সাহেব বিশ্বাস করেছিলেন ফর্মুলাটি সকল পাবলিক স্কুল এবং কলেজে শেখানো উচিত এবং তাঁর মতে, এটি সঠিকভাবে শেখানো হলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিপ্লব ঘটে যাবে এবং স্কুলে যে সময় অতিভাহিত করা

হয় তারচেয়ে অর্ধেক সময় ব্যয় করলেই চলবে।

এ বইতে বিশ্বাস নিয়ে যে অধ্যায়টি আছে তাতে আপনি পাঠ করবেন বিখ্যাত ইউনাইটেড স্টেটস স্টিল কর্পোরেশন এর আশ্চর্য কাহিনী। মি. কার্নেগির ফর্মুলা অনুসরণ করেই প্রতিষ্ঠানটি দানবীয় রূপ ধারণ করে। এক তরুণ তাঁর এ ফর্মুলায় বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁর নাম চার্লস এম. শোয়াব। কার্নেগির ফর্মুলা অনুসরণ করে তিনি বিশাল ধনসম্পদের মালিক হন। এবং তাঁর সম্পত্তির মূল্য ৬০০ মিলিয়ন ডলার।

কুড়ি বছরের প্রাকটিক্যাল টেস্টিংয়ের আগেই সিক্রেটটি তুলে দেয়া হয় সহস্রাধিক নারী-পুরুষের হাতে, যারা এটি ব্যবহার করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছেন। কেউ টাকা-পয়সাও কামিয়েছেন। আবার অনেকে এটির ব্যবহারের মাধ্যমে সংসারে ফিরিয়ে এনেছেন শান্তি। এক পাদ্রি সিক্রেটটি এতটাই সফলভাবে ব্যবহার করেন যে তাঁর বাৎসরিক আয় হতো ৭৫,০০০০০ ডলার।

সিনসিনাটির এক দরজি প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছিল ব্যবসায়, সে ফর্মুলাটি পরীক্ষা করে। তার ব্যবসা আবার প্রাণ ফিরে পায় এবং এর মালিকরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। মি. ন্যাশ মারা গেছেন কিন্তু এখনও তাঁর ব্যবসা দিব্যি চলছে।

এক্সপেরিমেন্টটি এতই চমৎকার ছিল যে খবরের কাগজ এবং পত্রিকাগুলো মিলিয়ন ডলারের পাবলিসিটি করেছিল।

আমি সিক্রেটটি জেনিংস ব্যানডলফকে বলেছিলাম সে কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরপর। সে ফর্মুলাটি এতটাই সফলভাবে ব্যবহার করে যে বর্তমান তৃতীয়বারের মতো কংগ্রেস সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে এবং হোয়াইট হাউসে যাওয়ারও একটি চমৎকার সুযোগ হয়েছে।

লা সাল্লে এক্সটেনশন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ করার সময় আমি ইউনির্ভাসিটির প্রেসিডেন্ট জে.জি. চ্যাপলিনের সঙ্গে দেখা করি। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়টি তেমন নামকরা ছিল না। তবে তিনি ওই ফর্মুলাটি ব্যবহার করার পরে লা সাল্লে হয়ে ওঠে দেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি যে সিক্রেটটির কথা বলছি তা এ বইতে পঞ্চাশাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সরাসরি কিছু বলা হয়নি। বিশেষ কোনো নামেও একে উল্লেখ করা হয়নি। মি. কার্নেগিও আমাকে এভাবেই বলেছিলেন। তবে Those who are ready এবং Searching for it লেখায় এ সিক্রেটটির বিষয়ে

সরাসরি আলোচনা করা হয়েছে।

তবে আপনি যদি এ গোপনীয়তা বা ফর্মুলাটি ব্যবহার করতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে এটিকে আপনার নিজেরই চিনে নিতে হবে। কারণ প্রতিটি অধ্যায়েই এর উল্লেখ রয়েছে। আমি নিজেই বলে দিতে পারতাম তাহলে এটি আপনাকে আবিষ্কারের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করত।

আমি যখন বইটি লিখছিলাম, আমার নিজের ছেলে, তখন সে কলেজের প্রথম বর্ষ শেষ করেছে, একদিন পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় অধ্যায়টি তুলে নিয়ে পড়ে এবং নিজেই সিক্রেটটি আবিষ্কার করে ফেলে। সে তথ্যটি এত চমৎকারভাবে কাজে লাগায় যে খুব ভালো বেতনের একটি চাকরি পেয়ে যায়। ওর গল্প দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

আপনি যখন বইটি পড়বেন তখন হয়তো এটাকে পাত্তা না-ও দিতে পারেন। কারণ বইটির শুরুতে প্রচুর প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে। তবে আপনি যদি হতাশ হন, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কাঠিন্যের মুখোমুখি হয়ে থাকেন, চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন, অসুস্থতা আপনাকে গ্রাস করেছে, সেক্ষেত্রে আমার ছেলে যে ফর্মুলার কথা বলেছে তা কাজে লাগিয়ে হতাশার মরুতে আশার মরুদ্যান দেখতেও পারেন, আপনি আসলে যার অনুসন্ধান করছেন।

এই সিক্রেটটি প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহার করেছিলেন। যারা যুদ্ধ করছিল, সেই প্রতিটি সৈনিককে এ সিক্রেটটির কথা বলা হয় তাদের ট্রেনিংয়ের সময়। প্রেসিডেন্ট উইলসন আমাকে বলেছেন যুদ্ধের জন্য ফান্ড তুলতে এ সিক্রেটটি একটি শক্তিশালী ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছিল।

কুড়ি বছরেরও আগে শ্রদ্ধেয় ম্যানুয়েল এল. বুয়েযন (তখন ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জের রেসিডেন্ট কমিশনার) এ সিক্রেটটি ব্যবহার করে তাঁর লোকদের জন্য স্বাধীনতা এনে দেন। তিনি ফিলিপাইনকে স্বাধীন করেন এবং মুক্ত রাষ্ট্রটির প্রথম প্রেসিডেন্টের পদ অলংকৃত করেন। এ সিক্রেটটির একটি মজার বিষয় হলো, যারা একবার এটি জেনে গিয়ে ব্যবহার করেছেন এবং বারবার সফল হয়েছেন, তাঁরা আর কোনোদিন ব্যর্থ হতে চাননি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে যারা এটি ব্যবহার করেছেন তাদের নামগুলোতে একবার চোখ বুলালেই আর অবিশ্বাস থাকবে না।

যে সিক্রেটটির কথা আমি বলছি তা টাকা দিয়ে কেনা যায় না, এ অমূল্য। তবে যারা এর খোঁজ করবে না তারা এটির সন্ধানও পাবে না।

এর সঙ্গে শিক্ষার কিন্তু তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। আমার জন্মের বহু আগে টমাস আলভা এডিসন এ সিক্রেটটি পেয়ে যান এবং এটি বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে ব্যবহার করে হয়ে ওঠেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। যদিও তিনি মাত্র তিন মাস স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। এ সিক্রেট জেনে যান মি. এডিসনের এক বিজনেস সহযোগী। তিনি বছরে মাত্র ১১,০০০ ডলার আয় করতেন। কিন্তু সিক্রেটটি জানার পরে তিনি বিপুল বিত্তবৈভবের অধিকারী হন এবং তরুণ অবস্থাতেই ব্যবসা থেকে অবসর নেন। এর গল্প প্রথম অধ্যায়েই আপনারা পাবেন। তখন বুঝতে পারবেন ধনী হওয়া আপনার নাগালের বাইরে নয়, আপনি যা হতে চান এখনও তা হতে পারবেন, পাবেন অর্থ, খ্যাতি, স্বীকৃতি এবং সুখ।

আমি এসব কথা জানলাম কী করে? এ বই পড়া শেষ করার আগেই আপনি জবাব পেয়ে যাবেন। জবাবটি আপনি প্রথম অধ্যায়ে পেতে পারেন আবার শেষ অধ্যায়েও এর উত্তর থাকতে পারে।

আমি যখন কুড়ি বছরের অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম, যে কাজটি নিয়েছিলাম মি. কার্নেগির অনুরোধে, আমি তখন শতাধিক সুপরিচিত মানুষকে বিশ্লেষণ করি, যাঁদের বেশির ভাগই স্বীকার করেছিলেন তাঁরা 'কার্নেগি সিক্রেট' অবলম্বন করেই বিপুল ধন সম্পদের মালিক হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন

১. হেনরি ফোর্ড

২. জন ওয়ানামেকার

৩. জর্জ এস. পার্কার

৪. হেনরি এল ডোহার্টি

৫. জর্জ ইস্টম্যান

৬. জর্জ ডব্লিউ ডেভিস

৭. উইলবার রাইট

৮ ড. স্টার জর্ডান

৯. চার্লস এস. সোয়াপ

১০. ড. ফ্রাংক গুণসালাস

১১. কিং জিলেট

১২. বিচারপতি ডেনিয়েল টি রাইট

১৩. টমাস আলভা এডিসন
১৪. এফ. ডব্লিউ উলওয়ার্থ
১৫. এডওয়ার্ড এ. ফিলিনি
১৬. আর্থার ব্রিসবেন
১৭. ডব্লিউ. এম. হাওয়ার্ড ট্যাফট
১৮. এডওয়ার্ড ডব্লিউ বক
১৯. এলবার্ট এইচ গ্যারি
২০. জন. এইচ. প্যাটারসন
২১. স্টুয়ার্ট অস্টিন উইয়ের
২২. জর্জ এম. আলেকজান্ডার
২৩. জেনিংস র‍্যানডলফ
২৪. ক্লারেন্স জরো
২৫. উইলিয়াম রিগলেন জুনিয়র
২৬. জেমস জে. হিল
২৭. ই. এম. স্টাটলার
২৮. সাইরাস এইচ কে. কার্টিস
২৯. থিওডর রুজভেল্ট
৩০. এলবার্ট হাবার্ড
৩১. উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান
৩২. জে. ওডগেন আরসুর
৩৩. হ্যারিস এফ. উইলিয়ামস
৩৪. ডেনিয়েল উইলার্ড
৩৫. র‍্যালফ এ উইকস
৩৬. জন ডি. রকফেলার
৩৭. ফ্রাংক এ. ভ্যানডারলিপ
৩৮. কর্নেল রবার্ট এ. বলার
৩৯. এডউইন সি. বার্নেস
৪০. উইড্রো উইলসন
৪১. লুথার বুরব্যাংক
৪২. ফ্রাংক এ. মুনসে

৪৩. আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল

৪৪. জুলিয়াস রোজেনওয়াল্ড

৪৫. ড. ফ্রাংক ক্রেন

৪৬. জে. সি. চ্যাপলিন

৪৭. আর্থার ন্যাশ

যে শতাধিক বিখ্যাত আমেরিকান রয়েছেন, যারা কার্নেগি সিক্রেট ব্যবহার করে সফল হয়েছেন, তাঁদের একটি ভগ্নাংশ মাত্র এখানে উল্লেখ করা হলো। আমি এমন কোনো লোকের কথা শুনিনি যারা সিক্রেটটি ব্যবহার করেও সাফল্য অর্জন করেননি।

বইটি পড়ার সময় স্মরণে রাখবেন এখানে শুধু ফ্যাক্টস দেয়া হয়েছে, এটি কোনো ফিকশন নয়। আর প্রথম অধ্যায় শুরু করার আগে ছোট একটি পরামর্শ দিই যা কার্নেগির সিক্রেটকে চেনার জন্য ক্লু হিসেবে কাজ করতেও পারে। আর তা হলো **যারা জীবনে অনেক কিছু অর্জন করেছেন, ধনী হয়েছেন, তাঁরা কিন্তু সকলেই একটি আইডিয়া নিয়ে শুরু করেছিলেন।**

আপনারা যদি সিক্রেটটি জানার জন্য প্রস্তুত থাকেন, যদিও আমার ধারণা এর অর্ধেক আপনারা ইতিমধ্যে বুঝে গেছেন, আর বাকি অর্ধেক আপনারা বুঝতে বা চিনতে পারবেন যে মুহূর্তে এটি আপনাদের মন বা মস্তিষ্কে পৌঁছাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে!

—লেখক

অনুবাদকের ভূমিকা

মুক্তদেশ থেকে প্রকাশিত আমার 'দ্য পাওয়ার অব ইয়োর সাবকনশাস মাইন্ড' এবং 'মাইন্ড রিডার'-এর আশাতীত সাফল্য লক্ষ করেই বোধকরি এর কর্ণধার 'Think and Grow Rich' বইটি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রকাশকের কাছেই শোনা এবং এ বইটি পড়ে জেনেছি তা সর্বকালের সেরা বেস্ট সেলারের তালিকায় রয়েছে। এই একটি বই লিখেই গত শতকের ত্রিশের দশকে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি পেয়ে যান এর রচয়িতা নেপোলিয়ন হিল। বইটি সম্পর্কে অবশ্য বিশ্বের নামী দামি অনেক ব্যক্তিত্বই ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

'থিংক অ্যান্ড গ্রো রিচ' এমন একটি বই যা বহু মানুষের মাঝে সম্পদশালী এবং ধনী হওয়ার আশা জাগিয়েছে এবং বইটিতে লেখা কিছু পরামর্শ ও নির্দেশাবলী অনুসরণ করে তাঁরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যেও পৌঁছাতে পেরেছেন। আশা করা যায় আমাদের দেশের পাঠকরাও এ বই পড়ে উপকৃত হবেন বিশেষ করে যারা ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন।

'থিংক অ্যান্ড গ্রো রিচ' অনুবাদ করার সময় কিছু কিছু অধ্যায় আমার কাছে চর্বিত চর্বন মনে হয়েছে। একই জিনিস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা। আর প্রচুর ব্যক্তিগত গল্প রয়েছে যেগুলোর কয়েকটি আমাকে আকর্ষণ করেনি, মনে হলো পাঠককুলও খুব একটা মজা পাবেন না। অনাকর্ষণীয় কিছু ঘটনা তাই এখানে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে প্রধান গল্পগুলো কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। আর চর্বি ছেঁটে দিয়ে এর রসটুকু অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। যদি পুরোটাই অনুবাদ করতাম তাহলে বইটির কলেবর অনর্থক বৃদ্ধি পেত এবং মনে হয় না অনাবশ্যক কিছু বিষয় পাঠ করে পাঠক খুব একটা মজা পেতেন।

পরপর তিনটি আত্ম উন্নয়নমূলক বই অনুবাদ করতে গিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হলো প্রায় প্রতিটি লেখকই কিছু কিছু বিষয় অনর্থক রাবারের মতো টেনে লম্বা করেন। মেদ-চর্বিহীন একটি গ্রন্থ, তা আকারে ছোট হলেও শুধুমাত্র লেখনীর গুণে পাঠকপ্রিয়তা পেতে পারে। একই কথার পুনরাবৃত্তি পাঠকদের বিরক্তির উদ্রেক ঘটায়। সে যাই হোক যে উদ্দেশে প্রকাশক এ বইটি প্রকাশ করছেন তা সফল হলেই ভালো। আশা করা যায় পাঠক বইটি পড়ে উপকৃতই হবেন।

অনীশ দাস অপু

সূচি

লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমেরিকার বিখ্যাত নেতাদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা

'THINK AND GROW RICH' প্রকাশের ২৫ বছর পূর্তি। এটি নেপোলিয়ন হিলের নবমতম গ্রন্থ। বইটি রচিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত সাফল্যের আইন কানুন দর্শনের ওপর ভিত্তি করে। তাঁর কাজ এবং লেখার অর্থ, শিক্ষা, রাজনীতি এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বিখ্যাত মানুষজন প্রশংসা করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট
ওয়াশিংটন ডিসি
প্রিয় **মি. হিল,**
আমি আপনার Low of Success ধর্মী টেক্সট বইগুলো পাঠ শেষ করেছি এবং এই দর্শন নিয়ে আপনি যে চমৎকার কাজ করেছেন তার প্রশংসা না জানিয়ে পারলাম না। এটি দেশের প্রতিটি রাজনীতিবিদের কাজে লাগবে। যে ১৭টি নীতির ওপর আপনার শিক্ষার ভিতগুলো গড়ে উঠেছে তা তারা আত্মীকৃত করতে পারলে তাদের লাভই হবে। এ বইতে এমন চমৎকার কিছু উপাদান রয়েছে যা প্রতিটি রাজনীতিবিদের দৈনন্দিন জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।
একান্ত আপনার
উইলিয়াম এইচ ট্যাফট
সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রধান বিচারপতি

প্রখ্যাত মার্কিন শ্রমিক নেতা
Mastery of the Law of Success দর্শনকে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ইনসিওরেন্স পলিসির সমান সমান বলে ভেবে নেয়া যায়।
স্যামুয়েল গম্পারস

ফাইভ অ্যান্ড টেন সেন্ট স্টোরের রাজ্য
সাফল্যের আইন-কানুন দর্শনের ১৭টি মৌলিকতত্ত্বকে ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা বেশ কিছু সফল স্টোরের একটি চেইন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে উলওয়ার্থ ভবনটিকে এই তত্ত্বগুলোর মনুমেন্ট বলা চলে।
এফ ডব্লু উলওয়ার্থ

বিখ্যাত স্টিমশিপ ম্যাগনেট
'আপনার Law of Success পড়ে আপনার প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছি। এ দর্শন যদি পঞ্চাশ বছর আগে আমার জানা থাকত তাহলে অর্ধেক সময়ের মধ্যে আমি এ পর্যন্ত যা অর্জন করেছি তা করে ফেলতে পারতাম। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি বিশ্ব আপনার এ দর্শন আবিষ্কার করবে এবং আপনাকে পুরস্কৃত করবে।'
রবার্ট ডলার

একজন মার্চেন্ট প্রিন্স
'আমি জানি আপনার সফল হওয়ার ১৭টি মৌলিক উপায় অতি চমৎকার কারণ গত ৩০ বছর ধরে এগুলো আমি আমার ব্যবসায়ে প্রয়োগ করে চলেছি।'
জন ওয়ানামেকার

বিশ্বের বৃহত্তম ক্যামেরা নির্মাতা
'আমি জানি আপনি আপনার Law of Success দিয়ে পৃথিবীর অনেক উপকার করছেন।'
জর্জ ইস্টম্যান

প্রখ্যাত বিজনেস চিফ
'আমি যেটুকু সাফল্যই অর্জন করে থাকি না কেন তার সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞ আপনার Law of Success এর ১৭টি মৌলিক নিয়মনীতির প্রতি আমি আপনার প্রথম ছাত্র হতে পেরে সম্মান বোধ করছি।'
ডব্লু এম. রিগান, জুনিয়র

এক

সূচনা

চিন্তার শক্তি

ত্রিশ বছর আগে এডুইন সি. বার্নেস আবিষ্কার করেন মানুষ যে সত্যি ভাবে এবং সমৃদ্ধি লাভ করে, কথাটি কতটা সত্যি। তবে তাঁর এ আবিষ্কার এক বসাতে আসেনি। অল্প অল্প করে তিনি বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন, শুরু করেছিলেন বিখ্যাত এডিসনের ব্যবসায়ী সহযোগী হওয়ার তীব্র বাসনা নিয়ে।

বার্নেসের আকাঙ্ক্ষা বা বাসনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সুনির্দিষ্ট। তিনি এডিসনের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলেন, তাঁর জন্য নয়। যখন এই আকাঙ্ক্ষা বা ইমপালস (তাড়না) তাঁর মনের মধ্যে প্রথম খেলে যায়, এটিকে নিয়ে কাজ করার মতো অবস্থানে তিনি ছিলেন না। তাঁর সামনে দু'টি কঠিন সমস্যা ছিল। প্রথমত মি. এডিসনের সঙ্গে তাঁর কোনো জানাশোনা ছিল না, দ্বিতীয়ত নিউজার্সির অরেঞ্জে যাওয়ার ট্রেন ভাড়া তাঁর কাছে ছিল না। এসব সমস্যা এরকম বাসনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষকেই নিরুৎসাহিত করে তুলত কিন্তু বার্নেস ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

বার্নেসের বাসনা কোনো সাধারণ কিছু ছিল না! তিনি এতটাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে শেষে সিদ্ধান্ত নেন হাল না ছেড়ে বরং 'ব্লাইণ্ড ব্যাগেজ' ভ্রমণ করবেন। এর মানে হলো, তিনি মালবাহী রেল গাড়িতে চড়ে ইস্ট অরেঞ্জে গিয়েছিলেন। তিনি মি. এডিসনের গবেষণাগারে পৌঁছে ঘোষণা করেন আবিষ্কর্তার সঙ্গে বাণিজ্য করার মানসে এখানে এসেছেন। বার্নেসের সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের বিষয়ে পরে মি. এডিসন বলেছেন, 'সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখতে লাগছিল নিতান্তই একজন ভবঘুরের মতো। তবে ওর চেহারার অভিব্যক্তিতে এমন কিছু ছিল যাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল সে যা পেতে এসেছে তা পাবার বিষয়ে বদ্ধ পরিকর। মানুষের সঙ্গে দীর্ঘসময় কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতে পারতাম কোনো মানুষ যখন কোনো কিছু গভীরভাবে পেতে চায়, সে তা পাবার

জন্য গোটা জীবন বাজি রাখতে পারে এবং সে অবশ্যই তা অর্জন করে। সে যা চাইছিল আমি তা পাবার জন্য তাকে সুযোগ করে দিই কারণ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ও যা চাইছে তা না পেয়ে ছাড়বে না, সে তার মন ঠিক করে ফেলেছিল এবং এ বিষয়ে ছিল অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এটাই প্রমাণ করে যে আমি ওকে চিনতে ভুল করিনি।'

প্রথম সাক্ষাৎকারেই কিন্তু এডিসনের সঙ্গে পার্টনারশিপটি পেয়ে যাননি বার্নেস। তবে এডিসনের অফিসে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন তিনি, যদিও বেতন ছিল অতি অল্প, কিন্তু এটা তাঁকে সুযোগ দেয় নিজের 'পণ্যদ্রব্য' তাঁর পার্টনারকে প্রদর্শিত করার। কয়েক মাস চলে যায়। দৃশ্যত: বার্নেস তখন তাঁর প্রত্যাশিত লক্ষ্যের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেননি যেটির জন্য তিনি নিজের মনকে প্রস্তুত করেছিলেন সুনির্দিষ্ট প্রধান লক্ষ্য হিসেবে।

মনোবিজ্ঞানীরা যথার্থই বলেছেন, 'যখন কেউ কোনো কিছুর জন্য প্রকৃত অর্থেই প্রস্তুত হয়, এটি তখন একটি আকার লাভ করে। বার্নেস প্রস্তুত ছিলেন এডিসনের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য, তাছাড়া তিনি ততদিন পর্যন্ত প্রস্তুত থাকার জন্য দৃঢ়সংকল্প ছিলেন যতদিন না তিনি যা খুঁজছেন তা পেয়ে যান।

তিনি নিজেকে একথা বলেননি যে, 'এসব করে লাভ কী? আমি বরং একজন সেলসম্যানের চাকরি খুঁজি। তিনি বরং নিজেকে বলেছেন, 'আমি এখানে এসেছি এডিসনের সঙ্গে কাজ করার জন্য, এতে যদি আমার সারাজীবনও চলে যায় তা-ও সই।'

সুযোগটি যখন এলো, ভিন্নরূপে তার আগমন ঘটল। তবে এরকমটিই আশা করেছেন বার্নেস। সুযোগ অনেক সময় চুপিচুপি খিরকির দুয়ার থেকে আসে। অনেকেই সেটি বুঝতে পারে না বলে সুযোগ নাগালে পেয়েও হারায়। মি. এডিসন তখন নতুন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, তখন নাম ছিল এডিসন ডিকটেটিং মেশিন (এখন সকলে চেনে এডিফোন হিসেবে)। তাঁর সেলসম্যানরা যন্ত্রটির বিষয়ে খুব একটা উৎসাহ বোধ করেনি। তাদের ধারণা ছিল এটি খুব একটা বিক্রি হবে না। আর বার্নেস এ সুযোগটিই কাজে লাগান। অদ্ভুত দর্শন যন্ত্রটির বিষয়ে শুধু বার্নেস এবং তাঁর আবিষ্কর্তা ছাড়া অন্য কারো কোনো আগ্রহ ছিল না।

বার্নেস জানতেন তিনি এডিসন ডিকটেটিং মেশিনটি বিক্রি করতে পারবেন। তিনি এডিসনকে তা বলেনও এবং বিক্রির সুযোগ পেয়ে যান। তিনি মেশিনটি বিক্রি করেন। সত্যি বলতে কী বিক্রিতে এতটাই সাফল্যের পরিচয় দেন তিনি যে

এডিসন তাঁকে এটি সারা দেশে পরিবেশনা এবং বাজারজাত করার দায়িত্ব দেন। বার্নেস মেশিনটি বিক্রি শুরু করেন একটি স্লোগান দিয়ে। আর তা হলো 'Made by Edison and installed by বার্নেস।'

দু'জনের এ ব্যবসায়িক মৈত্রী চলেছে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। এ ব্যবসা বার্নেসকে শুধু ধনীই করেনি তিনি আরো ব্যাপক অর্থে আরেকটি বিষয় প্রমাণ করেন যে, যে কেউ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকলেই 'ভাবতে পারে এবং সমৃদ্ধশালী হতে পারে।'

বার্নেস ব্যবসা করে দুই বা তিন মিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি হতো পেয়েছিলেন তবে তিনি এর ফলে অনেক বড় একটি অ্যাসেট অর্জন করেন তার কাছে এই অর্থমূল্য কিছুই নয়। তিনি স্পর্শের অগম্য চিন্তার তাড়নাকে অর্জন করেন, তাঁর সুনির্দিষ্ট জ্ঞানই তাঁকে এটি অর্জনে সহায়তা করেছিল।

বার্নেস আক্ষরিক অর্থেই নিজেকে বিখ্যাত এডিসনের সঙ্গে পার্টনারশিপ ব্যবসা করার কথা ভেবেছিলেন। নিজেকে তিনি একটি সম্পদ ভাবেন। শুরুতে তাঁর কাছে কিছুই ছিল না শুধু এই সামর্থটি ছাড়া– **তিনি যা চান তা জানতেন এবং যে আকাঙ্ক্ষাটি তাঁর মধ্যে ছিল তার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকার মতো সংকল্প তাঁর ভেতরে ছিল**। ব্যবসা শুরু করার টাকা ছিল না তাঁর। শিক্ষাদীক্ষারও তেমন বালাই ছিল না। কোনোরকম প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল না। তবে তাঁর ভেতরে ছিল ইনিশিয়েটিভ বা উদ্যম, বিশ্বাস এবং জিতবার ইচ্ছা। এই অকল্পনীয় শক্তিগুলোকে সঙ্গী করে তিনি বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীর এক নম্বর লোকে নিজেকে পরিণত করতে সমর্থ হন।

এবারে অন্য আরেকটি লোকের দিকে আমরা তাকাব যার ধনী হওয়ার প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে তা হারায় কারণ সে যা খুঁজছিল সেই লক্ষ্য থেকে মাত্র তিন হাত দূরে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

দুই

সোনা থেকে তিন হাত দূরে

ব্যর্থতার খুব সাধারণ একটি কারণ হলো সাময়িক পরাজয়েই হাল ছেড়ে দেয়া। প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো সময় এ ভুলের অপরাধবোধে ভোগে। আর.ইউ. ডার্বির একজন চাচা ছিলেন। তাঁকে সোনা আবিষ্কারের নেশায় পেয়েছিল। তিনি সোনা খুঁজতে গিয়েছিলেন পশ্চিমে। তবে তিনি কখনো শোনেননি যে পৃথিবীতে যত সোনা আছে তার চেয়ে অনেক বেশি স্বর্ণের মজুত রয়েছে মানুষের মস্তিষ্কে। তিনি অন্যদের মতো একটি জায়গা 'ক্লেইম' করে অর্থাৎ নিজের জন্য বেছে নিয়ে বেলচা আর ভারী কুড়াল নিয়ে কাজে নেমে গেলেন। কঠোর খাটনি তবে সোনার প্রতি তাঁর লালসা এ পরিশ্রমের পেছনে কিছুই নয়।

কয়েক সপ্তাহ বেদম খাটাখাটি শেষে অবশেষে পুরস্কার মিলল— চকচকে সোনার আকরের খোঁজ পেলেন ডার্বির চাচা। তবে মাটি খুঁড়ে সেই আকর তুলবার মতো যন্ত্রপাতি তাঁর কাছে ছিল না। তিনি দ্রুত খনি মাটি চাপা দিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে এলেন যন্ত্রপাতি কেনার জন্য টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতে। মেরিল্যান্ডের উইলিয়ামসবার্গে ছিল চাচার বাড়ি। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং কয়েকজন পড়শীকে জানালেন কী পেয়েছেন। তারা তাঁকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য টাকা ধার দিল। জাহাজে চাপিয়ে দেয়া হলো সেইসব মেশিনারি। চাচা এবং ডার্বি ফিরে গেলেন খনিতে কাজ করতে।

প্রথম গাড়ি আকরিক তুলে তা জাহাজে করে পাঠিয়ে দেয়া হলো গলিয়ে ফেলার জন্য। গলানো আকরিক থেকে যে পরিমাণ সোনা পাওয়া গেল তাতে বোঝা গেল তাঁরা কলোরাডোর অন্যতম সমৃদ্ধ স্বর্ণখনির মালিক বনে গেছেন। আর কয়েক গাড়ি আকরিক তুলে বিক্রি করতে পারলেই ধারদেনা সব শোধ হয়ে যাবে। এরপরে শুধু লাভ আর লাভ।

কিন্তু চাচা আর ডার্বির আশায় গুড়েবালি। তাঁরা আর সোনার খনির ধাতুশিরাই খুঁজে পেলেন না। স্রেফ উধাও হয়ে গেছে যেন। তাঁরা ইন্দ্রধনুর শেষ প্রান্তে চলে এসেছিলেন, কিন্তু এসে দেখেন প্রান্তে আর কিছু নেই—সব ফক্কা!

তাঁরা ড্রিল মেশিন দিয়ে মাটি খুঁড়ে চললেন, প্রাণপণে চেষ্টা করলেন গোল্ড ভেইন বা স্বর্ণ ধাতুশিরা খুঁজে বের করতে। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা পুরোটাই ব্যর্থ হলো।

অবশেষে তাঁরা হাল ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা যন্ত্রপাতিগুলো এক ভাঙারি বা পুরানো লোহালক্করের ব্যবসায়ীর কাছে সন্ধ্যায় বিক্রি করে দিয়ে ট্রেনে চড়ে ফিরে এলেন বাড়ি। যারা পুরানো লোহালক্কর কেনা-বেচার ব্যবসা করে তারা সাধারণত ভোঁতা টাইপের মানুষ হয়। তবে এ লোকটি তেমন ছিল না। সে এক মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে এনে ছোটখাটো একটু বিশ্লেষণ করল। ইঞ্জিনিয়ার তাকে বলল, প্রজেক্ট ফেল করার কারণ এর মালিকরা 'ফল্ট লাইন' সম্পর্কে কিছুই জানত না। সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখিয়ে দিল ডার্বিরা যেখানে খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ করে দিয়েছিল তার ঠিক তিন হাত দূরেই রয়েছে সেই প্রত্যাশিত ভেইন বা ধাতুশিরা।

ভাঙ্গারির দোকানদার ওই একটি খনিতে পাওয়া আকরিকের সোনা বিক্রি করে কোটিপতি বনে যায়। কারণ সে হাল ছেড়ে দেয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়ার কথা ভেবেছিল। যন্ত্রপাতি কেনার বেশিরভাগ টাকাই জোগাড় করেছিলেন আর.ইউ. ডার্বি। তখন তিনি তরুণ মাত্র। আত্মীয়-স্বজন এবং পড়শীরা তাঁকে বিশ্বাস করতেন বলেই টাকা ধার দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিটি পাঁই পয়সা পরিশোধ করেন। যদিও এজন্য তাঁকে গাধার খাটুনি খাটতে হয়েছে।

বহু পরে মি. ডার্বি আবিষ্কার করেন, আকাঙ্ক্ষাকে স্বর্ণে রূপান্তর ঘটানো যায়। এটি তিনি বুঝতে পারেন লাইফ ইনসিওরেন্স বিক্রির ব্যবসায় আসার পরে।

তাঁর মনে ছিল সোনা থেকে তিন হাত দূরে থেমে যাওয়ার কারণে বিপুল সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তাই ডার্বি নিজের অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রেখে নিজেকে বলতেন, 'আমি সোনার কাছ থেকে তিন হাত দূরে থেমে গিয়েছিলাম তবে লোককে ইনসিওরেন্স কিনতে বলার পরে তারা যখন 'না' বলে তবু আমি থেমে থাকব না।'

পঞ্চাশ জনেরও কম মানুষের একটি দল নিয়ে ডার্বি এক বছরে দশ লাখ ডলারেরও বেশি লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি বিক্রি করেছেন।

যে কোনো মানুষের জীবনে সাফল্য আসার আগে তাকে নিশ্চিতভাবেই সাময়িক কিছু পরাজয় মেনে নিতে হয় এবং কিছু ব্যর্থতাও।

যদি পরাজয় একজন মানুষকে ছাপিয়ে যায় তাহলে সে খুব সহজে যে কাজটি করে তা হলো, ওই কাজটি ছেড়ে দেয়। দেখা যায় বেশিরভাগ মানুষই এমনটি করে থাকেন।

এ বইয়ের লেখককে পাঁচশোরও বেশি অত্যন্ত সফল ব্যক্তি বলেছেন তাঁদের সাফল্য এসেছে ব্যর্থতার পরেই। তারা প্রথম পর্যায়ে পরাজিত হয়েছিলেন কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি বলে দ্বিতীয় পর্যায়ে সাফল্যের মুখ দেখেছেন।

এখানে মি. ডার্বির কিশোর বয়সের একটি গল্প বলি।

তাঁর এক চাচার পুরানো একটি ময়দার কল ছিল। ওখানে গম ভাঙানো হতো। আর তাঁকে এ কাজে সাহায্য করতেন ডার্বি। একদিন বিকেলে চাচা-ভাতিজা মিলে কাজ করছেন এমন সময় কারখানার দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল একটি নিগ্রো ছোট মেয়ে। সে চাচার ভাড়াটে কোনো চাষীর কন্যা। চাচার একটি বড় খামার আছে, সেখানে অনেক কৃষকও পেটেভাতে থাকে।

চাচা মেয়েটির দিকে মুখ তুলে চাইলেন, কর্কশ গলায় জানতে চাইলেন, 'কী চাই?'

ভীরু গলায় মেয়েটি জবাব দিল, 'মা পঞ্চাশ সেন্টের জন্য পাঠাইছে।'

'এখন টাকা পয়সা দিতে পারব না,' ঘাউ করে উঠলেন চাচা। 'যা ভাগ।'

'জ্বি, ছার' বলল মেয়েটি। তবে নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে।

চাচা আবার নিজের কাজে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, মেয়েটির কথা মনেই রইল না। তবে বেশ খানিক্ষণ কাজ করার পরে আবার মুখ তুলে চাইতে দেখেন মেয়েটি যায়নি তখনও, গ্যাঁট হয়ে বসেছে দরজার ধারে। হুংকার দিলেন চাচা, 'তোকে না বললাম বাড়ি যেতে। এখুনি যা নইলে কিন্তু মার খাবি।'

ছোট মেয়েটি বলল, 'জ্বি ছার।' কিন্তু এক চুলও নড়ল না।

চাচা এক বস্তা শস্য ফেলতে যাচ্ছিলেন কলের মুখে, মেঝে থেকে একটা কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে রাগে গনগনে চেহারায় এগিয়ে গেলেন মেয়েটির দিকে।

নি:শ্বাস বন্ধ করে রইলেন ডার্বি। তিনি নিশ্চিত চাচা মেয়েটাকে পিটিয়ে মেরেই ফেলবেন। ওই সময় শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা তাদের কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদেরকে গায়ে যখন তখন হাত তুলতেন। আর ডার্বির এই চাচাটি ছিলেন খুবই বদমেজাজী। আর কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের মুখে মুখে তর্ক করার কথা কল্পনাই করা যেত না।

চাচা যখন দোরগোড়ায় পৌঁছেছেন, নিগ্রো মেয়েটি এক কদম সামনে এগিয়ে এল, চাচার চোখে চোখ রেখে চিল চিৎকার দিল, **'আমার মায়ের ওই পঞ্চাশ সেন্ট লাগবেই।'**

দাঁড়িয়ে পড়লেন চাচা, ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন এক মুহূর্ত, তারপর লাঠিটা ফেলে দিলেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে আধ ডলার বের করে মেয়েটিকে দিলেন। মেয়েটি টাকাটা নিয়ে পিছিয়ে গেল দরজায়, তবে এক মুহূর্তের জন্যেও চাচার ওপর থেকে চোখ সরল না তার।

মেয়েটি চলে যাওয়ার পরে চাচা একটি বাক্সের ওপর বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তিনি বিস্ময় নিয়ে মেয়েটির সাহসের কথা ভাবছিলেন। মেয়েটি যেন একটি চাবুক কষিয়ে দিয়ে গেছে তাঁকে। মি ডার্বিও কিছু ভাবছিলেন। জীবনে এই প্রথম তিনি দেখেছেন কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শিশু তার শ্বেতাঙ্গ প্রভুর মুখের ওপর তর্ক করল। কীভাবে সে কাজটা করতে পারল? ডার্বির চাচার হম্বি-তম্বি, তর্জন-গর্জন কোথায় গেল? তিনি যে একেবারে ভেড়া সাজলেন। বাচ্চাটির মধ্যে এত শক্তি কী করে এল যে তার প্রভুর ওপর সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করল? এরকম অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় করে এল ডার্বির মনে তবে সেসব প্রশ্নের জবাব সেদিন মেলেনি, পেয়েছিলেন অনেক বছর পরে।

আমি সেই পুরানো ময়দার কলে গিয়েছিলাম। মি. ডার্বি আমাকে তাঁর কিশোর বয়সের গল্পটি পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন। 'আপনি এ থেকে কী পেলেন? ওই পুঁচকে মেয়েটা কী এমন অদ্ভুত ক্ষমতা ব্যবহার করেছিল যা আমার চাচাকে একদম চুপ করিয়ে দিয়েছিল?'

তাঁর এ প্রশ্নের জবাব এ বইতে মিলবে। জবাবটি পূর্ণাঙ্গভাবেই দেয়া আছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যার কারণে সকলেই এটি বুঝতে পারবেন এবং সেই মেয়েটির মতো একই শক্তি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

আপনার মনকে সতর্ক রাখুন, তাহলে দেখতে পাবেন কোন অদ্ভুত শক্তি ওই শিশুটিকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছিল, এ শক্তির রোশনাই আপনি আগামী অধ্যায়ে এক ঝলক দেখতে পাবেন। এ বইয়ের কোথাও আপনি একটি আইডিয়া খুঁজে পাবেন যা আপনার রিসেপটিভ পাওয়ার বা উপলব্ধির ক্ষমতাকে দ্রুততর করে তুলবে এবং আপনার নিজের উপকারের জন্য এটি নিজের মতো করে ব্যবহার করবেন। মনে রাখবেন এ এক অদম্য ক্ষমতা। এ ক্ষমতার সচেতনতা আপনার মধ্যে বইয়ের প্রথম অধ্যায় পাঠ করার মধ্যেই চলে আসতে পারে অথবা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতেও পেতে পারেন। এমনকী এটি একটি সিঙ্গল আইডিয়া হিসেবেও আপনার চোখে ধরা পড়তে পারে। অথবা আসতে পারে কোনো পরিষ্কার রূপ ধরে কিংবা উদ্দেশ্যের আকারে।

মি. ডার্বি আমাকে বলেছেন তাঁর সাফল্যের পেছনে নিগ্রো মেয়েটির সেদিনকার ঘটনাটি যথেষ্টই প্রভাব রেখেছে। তিনি বলেন, 'যতবারই আমি কোনো ইনসিওরেন্স পলিসি বিক্রিতে বাধার সম্মুখীন হয়েছি, মনে হয়েছে এটি ক্লায়েন্টের কাছে বিক্রি করতে পারব না, ততবারই সেই ময়দার কলের মেয়েটির ছবি আমার চোখে ভেসে উঠেছে, দেখেছি তাকে আত্মরক্ষার্থে রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে, তখন আমি নিজেকে বলেছি, "এই সেলটা আমাকে করতেই হবে। এবং যতগুলো ভালো সেল আমার হয়েছে তার প্রায় সবই ঘটেছে লোকে আমাকে **'না'** বলার পর।"

তিনি স্মরণ করেন, সোনা থেকে তিন হাত দূরে থেমে যাওয়ার ভুলের কথাও। 'তবে,' বলেন তিনি, 'এ অভিজ্ঞতা একদিক থেকে আমার জন্য ছিল শাপে বর।' এটি আমাকে কাজে লেগে থাকতে শিখিয়েছে এবং সে কাজটি যতই কঠিন হোক না কেন হাল ছাড়তে মানা করেছে, এবং সাফল্য পাবার জন্য এ শিক্ষাটি আমার বড়ই প্রয়োজন ছিল।'

আপনি যখন ভাববেন এবং সমৃদ্ধ হতে শুরু করবেন, লক্ষ্য করবেন সমৃদ্ধশালীরা তাঁদের কাজ শুরু করেন মনের একটি বিশেষ অবস্থা নিয়ে, তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে সুনির্দিষ্ট। আমি পঁচিশ বছর গবেষণায় ব্যয় করেছি, ২৫০০০ এরও বেশি লোকের বিশ্লেষণ করেছি এবং আমিও জানতে চেয়েছি ধনবানরা কীভাবে স্থির একটি মনের অধিকারী হয়ে ওঠেন।

১৯২৯ সালে আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্যে মহামন্দা শুরু হয়। দীর্ঘ একটা সময় ধরে অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছিল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ক্ষমতায় আসার পরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। মহামন্দা মিলিয়ে যায়। যেমন একজন ইলেকট্রিশিয়ান থিয়েটারের এমনভাবে আলোর ব্যবস্থা করেন যাতে আপনি বুঝে উঠবার আগেই দেখতে পান অন্ধকার কেটে চারিদিক ভরে গেছে আলোয় এবং আঁধারে থাকার ভয়টা মানুষের মন থেকে দূর হয়ে গেছে।

খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে এই দর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলো আপনিও আয়ত্ব করতে পারবেন। আপনার আর্থিক অবস্থারও উন্নতি ঘটবে এবং আপনি যাতেই হাত ছোঁয়াবেন, সোনা হয়ে যাবে। অসম্ভব মনে হচ্ছে কথাটা? মোটেই তা নয়!

মানুষের মূল দুর্বলতার অন্যতম হলো 'অসম্ভব' শব্দটি। সে জানে কী কী করলে কাজ হবে না। সে জানে কী কী করা যাবে না। এ বইটি তাদের জন্য লেখা হয়েছে যারা সেইসব নিয়ম-কানুনগুলো খুঁজে বেড়ান যা মানুষকে সফল করেছে।

মনে রাখবেন সাফল্য তাঁদের কাছেই ধরা দেয় যারা **সাফল্য সচেতন** আর ব্যর্থ তারাই হয় যারা উদাসীনভাবে অসাফল্যকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসে বা **ব্যর্থতা সচেতন**।

এ বইটি তাদেরকে সাহায্য করবে যারা ব্যর্থ সচেতনতা থেকে সফল সচেতন কীভাবে হওয়া যাবে তা শিখতে চায়।

মানুষের আরেকটি দুর্বলতা হলো, সে নিজে যা তা দিয়ে অন্য সবাইকে বিচার করে। যারা এ বই পড়ছেন তাঁদের কেউ কেউ হয়তো ধরেই নিয়েছেন বইটি পড়ে কোনোই লাভ হবে না, এটি তাদেরকে 'Grow Rich' করতে পারবে না। এরা কখনো সমৃদ্ধির কথা ভাবতেই পারে না। কারণ এদের চিন্তাভাবনা সবসময় ঘুরপাক খায় দারিদ্র, অভাব, দুঃখ ব্যর্থতা এবং পরাজয়ের মাঝে।

আমরা বোকার মতো বিশ্বাস করি যে আমাদের সীমাবদ্ধতা দিয়েই অন্যদের সীমাবদ্ধতাকে নিরূপণ করা যায়।

হেডলি শিখিয়েছেন, 'আমি আমার নিয়তির নিয়ন্ত্রক, আমার আত্মার পরিচালক।' কথাটা সত্যি। কারণ আমাদের ক্ষমতা আছে আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার।'

তিন

আকাঙ্ক্ষা

সকল অর্জনের সূচনা বিন্দু

ধনী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ

ত্রিশ বছর আগে এডুইন সি বার্নেস যখন মালবাহী রেলগাড়ি থেকে নিউজার্সির অরেঞ্জ শহরে নেমে পড়েন তখন তাঁর চেহারা ভবঘুরের মতো দেখালেও তাঁর চিন্তা-ভাবনাগুলো ছিল রাজার মতো!

রেল রোড থেকে তিনি যখন টমাস আলভা এডিসনের অফিসে যান, তাঁর মন ছিল সক্রিয়। তিনি এডিসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁকে এডিসনের সঙ্গে কোনো কাজ করতে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন যা ছিল তাঁর আজন্ম স্বপ্ন, বিশ্বখ্যাত আবিষ্কর্তাটির ব্যবসায়িক সহযোগী হওয়ার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর হৃদয়ে।

বার্নেসের এ আকাঙ্ক্ষা ছিল দীর্ঘদিনের। তবে মনের মাঝে আকাঙ্ক্ষাটির প্রথম উদয়কালে এটি হয়তো কেবল একটি ইচ্ছা ছিল কিন্তু এডিসনের সামনে দাঁড়ানোর মানে এ স্রেফ একটি ইচ্ছাই ছিল না।

কয়েক বছর পরে, এডুইন সি. বার্নেস আবার গিয়ে এডিসনের সামনে দাঁড়ান, সেই একই অফিসে যেখানে প্রথমবার সাক্ষাৎ হয়েছিল বিজ্ঞানীটির সঙ্গে। তবে এবারে সেই **আকাঙ্ক্ষা** রূপ নিয়েছিল বাস্তবতায়। তিনি তখন এডিসনের সঙ্গে ব্যবসা করছেন। তাঁর জীবনের স্বপ্নের ঘটেছে বাস্তবায়ন।

আজকাল লোকে, যারা বার্নেসকে চেনে, জানে, তাঁকে ঈর্ষা করে। বলে জীবন তাঁকে একটা 'সুযোগ' দিয়েছিল বটে। তারা বার্নেসের বিজয়টাকেই শুধু দেখে কিন্তু তিনি কী করে সফল হলেন সেই কারণগুলো কেউ খতিয়ে দেখতে চায় না।

বার্নেস সফল হয়েছিলেন কারণ তিনি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্বাচন করেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি, ইচ্ছা শক্তি, সকল পরিশ্রম সবকিছুই ওই লক্ষ্য অর্জনের পেছনে ব্যয় করেন। তিনি অরেঞ্জ সিটিতে পৌঁছামাত্র এডিসনের

পার্টনার হতে পারেননি। খুবই অল্প বেতনে শুরু করেছিলেন কাজ, যতদিন না নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এক কদম এগোনো যায়, কাজ করে গেছেন। যে সুযোগের সন্ধানে তিনি ছিলেন তা তিনি পেয়ে যান টানা পাঁচ বছর পরিশ্রম করার পরে। অতগুলো বছরে একটি দিনের জন্যেও কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কোনো আশার আলো দেখতে পাননি বার্নেস। সবাই তাঁকে এডিসনের ব্যবসার সামান্য একজন কর্মচারী বলেই ভাবত কিন্তু তিনি মনে মনে নিজেকে এডিসনের পার্টনার ভাবতেন। আর এ ভাবনাটি প্রতিটি মিনিট জুড়েই ছিল তাঁর মনের মাঝে।

এ হলো সুনির্দিষ্ট **আকাঙ্ক্ষা**'র এক স্মরণীয় রূপ। বার্নেস তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছিলেন কারণ, তিনি মি. এডিসনের ব্যবসায়ী সহযোগী হতে চেয়েছিলেন, আর কিছু চাননি। তিনি এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি পরিকল্পনাও করেছিলেন।

বার্নেস যখন অরেঞ্জে যান, নিজেকে এ কথা বলেননি যে, "আমি এডিসনের কাছে কোনো চাকরি চাইব," বলেছেন, "আমি এডিসনের সঙ্গে দেখা করব এবং তাঁকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে বলব যে আমি এসেছি তাঁর সঙ্গে ব্যবসা করতে।"

তিনি এ কথা বলেননি, '"আমি কয়েক মাস চাকরি করব, কোনো উৎসাহ না পেলে ওটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নেব।" তিনি বলেছিলেন, "আমি যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করব। এডিসন যা করতে বলবেন তা-ই করব। তবে কাজ শেষ হওয়ার আগেই আমি তাঁর সহযোগী হয়ে যাব।"

তিনি বলেননি, "এডিসনের প্রতিষ্ঠানে যা চাইছি তা যদি না মেলে তবে চোখ কান খোলা রাখব অন্য কোনো সুযোগ পাবার জন্য।" তিনি বলেছিলেন, "পৃথিবীতে একটি জিনিসই পাবার জন্য আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং তা হলো টমাস আলভা এডিসনের সঙ্গে ব্যবসা করা। আমি যা চাই তা পাবার জন্য আমি আমার গোটা ভবিষ্যতকে বাজি রাখব।"

শিকাগো শহরে একবার ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। স্টে স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে একদল ব্যবসায়ী দেখেন তাঁদের দোকানপাট দাউ দাউ করে পুড়ে যাচ্ছে আগুনে। তারা একটি মিটিং করেন আলোচনা করার জন্য যে তারা কি ভবন পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করবেন নাকি শিকাগো ছেড়ে দেশের অন্য কোনো শহরে গিয়ে নতুন করে ব্যবসার চিন্তা করবেন। সবাই শিকাগো ত্যাগ করার পক্ষে থাকলেও একজন তাতে রাজি হলেন না।

ওই ব্যবসায়ী সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এ শহরেই থাকবেন। নিজের ভস্মীভূত

দোকানের ধ্বংসাবশেষের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, আমি ওই জায়গাতেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্টোর গড়ে তুলব, তাতে যদি দোকান বারবারও পুড়ে যায় কিছু আসে যায় না।'

এ ঘটনা পঞ্চাশ বছর আগের। সেখানে দোকান তৈরি হয়েছিল। সেই দোকানটি এক সুউচ্চ মনুমেন্ট, সগর্বে মাথা উঁচু করে আছে আকাশে, যেন মনের তীব্র **আকাঙ্ক্ষা'**র এক প্রতিভূ। সেই ভদ্রলোকটির নাম ছিল মার্শাল ফিল্ড। যে কাজটি মার্শাল ফিল্ডের জন্য সহজ ছিল, তাঁর সহকর্মীরাও কিন্তু একই কাজ করতে পারতেন। এখানেই পার্থক্য ছিল মার্শাল ফিল্ড এবং তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে। এবং একই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এডিসনের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সহস্র কর্মচারীর সঙ্গে এডুইন সি. বার্নেসের। একই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যারা সফল হয়েছে তাদের সঙ্গে যারা সফল হতে পারেননি।

বড় হলে সবাই টাকার গুরুত্ব বুঝতে পারে। টাকা পেতে চায়। তবে চাইলেই তো আর টাকা পাওয়া যায় না। ধনী হওয়াও যায় না। তবে মনে যদি থাকে ধনী হওয়ার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, থাকে যদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং ধৈর্য তাহলে সেই লোকের সমৃদ্ধশালী হওয়া ঠেকায় কে?

ধনী হতে চাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষার ছয়টি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ রয়েছে। এগুলো হলো:

১. আপনি ঠিক কত পরিমাণ টাকার মালিক হতে চান তা আগে ঠিক করুন। শুধু বললেই হবে না যে, 'আমি প্রচুর টাকা চাই।'

২. আপনি যে পরিমাণ অর্থ পাবার আকাঙ্ক্ষা করছেন তার বদলে কী দিতে রাজি আছেন সে বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হোন।

৩. আপনার আকাঙ্ক্ষিত অর্থের মালিক কবে নাগাদ হতে চান তারও একটি সুনির্দিষ্ট দিন-তারিখ ঠিক করুন।

৪. আপনি যা বা আকাঙ্ক্ষা করছেন তার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করুন এবং আপনি প্রস্তুত থাকুন বা না থাকুন, কাজে নেমে যান।

৫. একটি কাগজে পরিষ্কার করে লিখুন আপনি কত টাকা আয় করতে চান, এই পরিমাণ অর্থ কবে নাগাদ অর্জন করতে চাইছেন, অর্থপ্রাপ্তির বিনিময়ে আপনি নিজে কী দিতে পারবেন এবং এ অর্থ কীভাবে জোগাড় করবেন বলে ভাবছেন তার একটি পরিষ্কার ছকও করে ফেলুন।

৬. আপনার লেখা কাগজটি প্রতিদিন দু'বার জোরে জোরে পড়বেন, একবার

পড়বেন ঘুমাতে যাওয়ার আগে, দ্বিতীয়বার পড়বেন সকালে ঘুম থেকে উঠে। **'পড়ার সময় মনে হবে আপনি সত্যি আপনার কাঙ্ক্ষিত অর্থ পেয়ে গেছেন।**

এই ছয়টি পদক্ষেপ অনুসরণ করা জরুরি। বিশেষ করে ষষ্ঠ প্যারাগ্রাফটি লক্ষ করুন এবং ওখানকার পরামর্শ অনুসরণ আপনার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আপনি হয়তো বলতে পারেন টাকা পাবার আগেই টাকা পেয়ে গেছেন, এমনটি ভাবা আপনার জন্য অসম্ভব ব্যাপার। আর এখানেই **তীব্র আকাঙ্ক্ষা** এগিয়ে আসবে আপনার সাহায্যে। আপনার যদি সত্যি টাকা পাবার কামনা থাকে, আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে একটি অবসেশন, তাহলে আপনি যে টাকাটা পাবেনই তা মনকে বোঝাতে খুব একটা কষ্ট হবে না। আসল বিষয় হলো টাকাটা আপনার চাইতে হবে এবং এটি পাবার জন্য এতটাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠবেন যে নিজেকে বোঝাতে পারবেন আপনি টাকাটা পাবেন।

যারা 'অর্থ সচেতন' হন তারা ধনী হয়ে ওঠেন। 'অর্থ সচেতনতার মানে মনের মধ্যে অর্থ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এতটাই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যায় যে সে দেখতে পায় টাকাটা পেয়ে গেছে।

যে ছয়টি পদক্ষেপের কথা বলা হলো সেগুলো কিন্তু এন্ড্রু কার্নেগির কথা। তিনি একটি ইস্পাত কারখানায় একজন সাধারণ শ্রমিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তবে এ পদক্ষেপগুলো তাঁকে এক সময় একশো মিলিয়ন ডলারের মালিক বানিয়ে দেয়।

এই ছ'টা পদক্ষেপ প্রয়াত টমাস আলভা এডিসনও সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করেছিলেন। তবে আপনি যদি মন থেকে বিশ্বাস না করেন যে আপনার প্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে না তাহলে কিন্তু সত্যি টাকা পাবেন না।

আপনাকে কল্পনায় সমৃদ্ধশালীদেরকে দেখতে হবে। ব্যাংক ব্যালান্সের মধ্যে তা দেখতে পাবেন না। পরিবর্তিত এ পৃথিবীতে অতীতের বিখ্যাত সব মানুষের শক্তি আপনাকে ধরতে হবে যাদের স্বপ্ন এ সভ্যতাকে সবরকমের মূল্যায়ন দিয়েছে, যে স্পিরিট আমাদের নিজেদের দেশের জীবন–শোনিত হিসেবে কাজ করছে, সুযোগ দিচ্ছে আপনাকে এবং আমাকে, আমাদের প্রতিভাগুলোর উন্নয়ন ঘটাচ্ছে।

ভুলে যাবেন না কলম্বাস এক অচেনা-অজানা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এরকম একটি পৃথিবী আবিষ্কারের নেশায় ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছিলেন নিজের জীবন এবং সেই দেশটি তিনি অবশেষে আবিষ্কার করেন।

প্রখ্যাত জোর্তিবিদ কোপার্নিকাস প্রাচুর্যময় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন, যে দুনিয়া হবে বহুসংখ্যক। তিনি তা আবিষ্কার করার পরে কেউ তাঁকে 'অবাস্তববাদী' বলে গালাগাল পাড়েনি। তার বদলে পৃথিবী তার পূজো করেছে।

আপনি যদি মনে করেন যে কাজটি করছেন তা সঠিক এবং আপনি তাতে বিশ্বাসও করেন, তবে এগিয়ে যান। কাজটি করুন। সামনে রাখুন স্বপ্নকে, 'তারা' কী বলে এসবে একদমই পাত্তা দেবেন না যদি আপনার সাময়িক পরাজয়ও ঘটে থাকে। কারণ 'তারা' জানে না *প্রতিটি ব্যর্থতার মাঝেই রয়েছে একটি সাফল্যের বীজ*।

চার

প্রতিটি ব্যর্থতার মাঝে লুকিয়ে থাকে সাফল্যের বীজ

হেনরি ফোর্ড, অশিক্ষিত এবং দরিদ্র, স্বপ্ন দেখতেন অশ্ববিহীন একটি বাহনের, সঙ্গে যেসব যন্ত্রপাতি ছিল তা নিয়েই কাজে নেমে গেলেন, কবে সুযোগ আসবে তার অপেক্ষা করলেন না। আর আজ তাঁর স্বপ্নের ফলাফল গোটা পৃথিবী বাঁধা পড়েছে একটি বন্ধনীতে।

টমাস এডিসন একটি বাতির স্বপ্ন দেখতেন যা চলবে বিদ্যুতে, তিনি নিজের স্বপ্ন নিয়ে শুরু করে দিলেন কাজ এবং দশ হাজার বারেরও বেশি ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি ওই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে তবেই বিরত হলেন। বাস্তববাদী স্বপ্নচারীরা কখনো হাল ছাড়েন না!

ওয়েলান সিগারের চেইন স্টোর গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি তাঁর স্বপ্নকে কাজে রূপান্তরিত করেন, তারই ফল আজ আমেরিকার প্রতিটি কোন দখল করে রেখেছে ইউনাইটেড সিগার স্টোর।

কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদেরকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতেন লিংকন এবং স্বপ্নের বাস্ত বায়নে তিনি নেমে পড়েন। উত্তর এবং দক্ষিণের মাঝে বন্ধন স্থাপনের দৃশ্যটি তিনি দেখে যেতে পারেননি বটে তবে ক্রীতদাসিরা তাঁরই কারণে শতবছরের বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করে।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এমন এমন একটি যন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন যা আকাশে উড়বে। তাঁদের স্বপ্ন পূরণের প্রমাণ আজ সারা বিশ্বজুড়ে।

মার্কোনি এমন একটি সিস্টেমের স্বপ্ন দেখেছিলেন যা ইথারের অধরা শক্তিকে ধরতে পারবে। তাঁর স্বপ্ন বৃথা যায়নি, সারা পৃথিবীতেই আজ রেডিও আছে। তবে মার্কোনি যখন বলেছিলেন তিনি তারের সাহায্য ছাড়াই বাতাসে খবর প্রেরণ করবেন, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে পাগল ভেবে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল চিকিৎসা করাতে।

বিশ্ব এখন নতুন নতুন আবিষ্কার দেখে অভ্যস্ত। আর স্বপ্নচারী মানুষগুলোই এসব আবিষ্কার করেছেন। তবে এদের বেশিরভাগই প্রথমে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁরা জানতেন ব্যর্থতার মাঝেই লুকিয়ে থাকে সাফল্যের বীজ।

আপনি হয়তো কোনো কাজ করতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন, বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন। কিন্তু লেগে থাকুন, সাফল্য আসবেই। এডিসন আগে ছিলেন এক ভবঘুরে টেলিগ্রাফ অপারেটর। তিনি কোনো কিছু আবিষ্কার করতে গিয়ে কতবার যে ব্যর্থ হয়েছেন তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা প্রতিভাটির বিস্ফোরণ ঘটলে তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

হেলেন কেলার জন্মের কিছুদিন পরেই বোবা, কালা এবং অন্ধ হয়ে যান। শারীরিক এই প্রতিবন্ধকতা কিন্তু তাঁকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। ইতিহাসের সেরা মানুষদের তালিকায় ঠিকই জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর গোটা জীবন এ কথাটিই প্রমাণ করে পরাজয়কে বাস্তবতা হিসেবে মেনে না নিলে কেউ কখনো পরাজিত হয় না।

বিঠোফেন কানে শুনতে পেতেন না, মিলটন চোখে দেখতেন না। অথচ এরাই কালজয়ী সঙ্গীত ও সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। এটা পেরেছিলেন কারণ তাঁরা কালজয়ী স্বপ্ন দেখতেন এবং তাঁদের স্বপ্নগুলোকে গঠনমূলক চিন্তাভাবনায় রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন।

কোনো কিছু চাওয়া এবং সেটি পাবার জন্য প্রস্তুত থাকা দুটি ভিন্ন জিনিস। কেউ যদি বিশ্বাস না করে সে অমুক জিনিসটি পেতে পারে তাহলে তা পাবার জন্য সে প্রস্তুতও হয় না। মনের মধ্যে প্রবল বিশ্বাস আনতে হবে। স্রেফ ইচ্ছা করলে বা আশা থাকলেই হবে না। আর বিশ্বাসের জন্য খোলা মন খুব দরকার। সন্দেহে ঢাকা মনে বিশ্বাস, সাহস, আস্থা কোনোকিছুরই জায়গা নেই।

আমার একটি ছেলে হয়েছিল চব্বিশ বছর আগে। তার কান ছিল না। ডাক্তাররা ঘোষণা করেছিলেন আমার ছেলে কালা হবে, সারা জীবন হয়তো কথাও বলতে পারবে না।

আমি ডাক্তারদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করি। আমি সিদ্ধান্ত নিই আমার ছেলে কানে শুনবে, কথাও বলতে পারবে। আমার মনে এ বিশ্বাসটি সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল। আমার মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমি সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও এক চুল সরে যাইনি।

আমার ছেলের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আশেপাশের বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে শুরু করে। আমরা লক্ষ্য করি সে যেন অল্প অল্প শুনতেও পাচ্ছে। বাচ্চারা যখন আধো বুলিতে কথা বলতে শুরু করে ওই বয়সটিতে সে একেবারেই নিশ্চুপ ছিল। তবে

তার অঙ্গভঙ্গি দেখে বুঝতে পারি কিছু নির্দিষ্ট শব্দ ও শুনতে পায়। আর এ বিষয়টি জানাই আমার দরকার ছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম ও যদি সামান্যতমও শুনতে পায় তাহলে ওর শুনবার ক্ষমতা বা সামর্থ বৃদ্ধি পেতে পারে। তারপর এমন একটি ঘটনা ঘটল যা আমাকে আশান্বিত করে তুলল। একেবারেই অপ্রত্যাশিত একটি বিষয় থেকে ঘটনার সূত্রপাত।

আমরা একটি ভিকট্রোলা কিনেছিলাম। বাচ্চাটি যখন প্রথমবার মিউজিক শুনতে পেল, উল্লসিত হয়ে উঠল। তাৎক্ষণিকভাবে যন্ত্রটি তার পছন্দ হয়ে গেল। একবার সে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে 'Its a Longway to tippery' গানটি বাজল। পুরো সময়টি দাঁড়িয়ে থাকল ভিকট্রোলার সামনে, কেসটি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। তারপর থেকে লক্ষ্য করলাম সে আমার ঠোঁট নড়া বুঝতে পারছে। আমি তখন আমার মনের কাছে প্রবলভাবে আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম আমার ছেলে যেন কানে শুনতে পায় এবং কথা বলতে পারে। আবিষ্কার করলাম বাচ্চাটি বেডটাইম স্টোরি খুব পছন্দ করে। তাই আমি ওকে ঘুম পাড়ানোর সময় বিছানায় শুয়ে ওকে নানান গল্প শোনাতে শুরু করলাম। এসব গল্প ছিল আমার নিজের বানানো। আমার মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, বিশ্বাস ছিল আমার ছেলে একদিন কথা বলতে পারবে, কানে শুনতে পাবে। আর এ অনুপ্রেরণা থেকেই আমি কাজ চালিয়ে যেতে থাকলাম।

আমি ওকে যা বলতাম ও তা নিয়ে কখনোই কোনো প্রশ্ন তুলত না। ওর কান নেই বলে ওর স্কুলের শিক্ষকরা ওর বিশেষ যত্ন নিতেন। আমরা লক্ষ্য করি ধীরে ধীরে ছেলেটির শুনতে পাবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সাত বছর বয়সে সে প্রথম প্রমাণ দেখায় যে তার মন নিয়ে আমরা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছি তার একটি ফল লাভ করা যাচ্ছে। আমি ওকে বলতাম ও যখন যথেষ্ট বড় হবে তখন খবরের কাগজ বিক্রি করতে পারবে। (ওর বড় ভাই ছিল কাগজ ব্যবসায়ী) ছেলেটা আমার কথায় ভারী উৎসাহ পেত। সে তার মাকে কাকুতি মিনতি করত তাকে যেন খবরের কাগজ বিক্রির অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু ও কানে শুনতে পায় না বলে ওর মা ওকে একা রাস্তায় চলাফেরা করতে দিতে ভয় পেত।

অবশেষে একদিন ও নিজেই কাজে নেমে পড়ল। সেদিন আমরা বাসায় কেউ ছিলাম না। ও বাড়িতে একা ছিল চাকরবাকরের সঙ্গে। সে কিচেনের জানালা দিয়ে নেমে পড়ল। পড়শী মুচির কাছ থেকে ছয় সেন্ট ধার করে, তা দিয়ে কাগজ কিনে আবার তা বিক্রি করে দিল। তারপর সেই টাকা দিয়ে আবারও কাগজ

কিনল। এরকম চলল রাত পর্যন্ত। কত আয় হয়েছে তা গুণে নিয়ে, পড়শীর ধার শোধ করে সে যখন বাসায় ফিরল, তখন তার নেট প্রফিট হয়েছে বিয়াল্লিশ সেন্ট। আমরা রাতে বাড়ি ফিরে দেখি ও ঘুমাচ্ছে, মুঠোয় শক্ত করে ধরা জীবনের প্রথম উপার্জন।

ওর মা ছেলের মুঠো খুলে টাকা দেখে চেঁচিয়ে উঠল। ছেলে এমন দারুণ একটা কাজ করেছে কোথায় খুশি হবে তা না, কান্নাকাটি করে একশেষ! আমার প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। আমি হো হো করে হাসছিলাম কারণ বাচ্চার মনে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখার যে প্রচেষ্টা আমি এতদিন চালিয়ে এসেছি আজ তা সফল হলো।

তার মা'র কান্নাকাটি করার কারণ সে তো ব্যাপারটি দেখেছে এই ভাবে– একটি বোবা-কালা ছোট্ট ছেলে রাস্তায় গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উপার্জন করেছে। কিন্তু আমি ওকে দেখেছি একজন সাহসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আত্মবিশ্বাসী খুদে ব্যবসায়ী হিসেবে যার ভেতরকার যোগ্যতা শতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ সে নিজের উদ্যোগে নেমে পড়েছিল ব্যবসায় এবং জিতেও গেছে। আমি তার এই রূপান্তরে খুশি কারণ জানতাম এটি তাকে যে দক্ষতা দিয়েছে তা সারাজীবন সে কাজে লাগিয়ে চলতে পারবে।

পরে আমার এ কথা সত্যি হয়েছে। তার বড় ভাই যখন কিছু চাইত, মেঝেতে শুয়ে পড়ে শূন্যে পা ছুড়ে কান্নাকাটি করত। কিন্তু আমার ছোট ছেলেটা কোনো কিছু চাইলে সে টাকাটা কামানোর একটি পরিকল্পনা করত এবং সেভাবে কাজে নেমে পড়ত। এখনো সে এভাবেই কাজ করে যাচ্ছে।

সত্যি বলতে কী আমার ছেলে আমাকে শিখিয়েছে প্রতিবন্ধকতাও পাথরের ধাপে পরিণত হতে পারে যা দিয়ে কেউ তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে যদি না ওগুলোকে তারা বাধা হিসেবে মনে করে।

সেই ছোট্ট কানে শুনতে না পাওয়া ছেলেটি প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজের গণ্ডি পার হয়েছে তাঁর শিক্ষকদের কথা প্রায় শুনতে না পেরেই। শুনতে পেরেছে যখন শিক্ষকরা জোরে কথা বলেছেন কিংবা ওর কানের কাছে মুখ এনে লেকচার শুনিয়েছেন। সে বোবা-কালাদের স্কুলে যায়নি। আমরা তাকে সাইন ল্যাংগুয়েজও শিখাইনি। আমরা সংকল্পবদ্ধ ছিলাম ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে, স্বাভাবিক ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মিশবে এবং আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলাম যদিও এ নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বহু তর্ক করতে হয়েছে।

ও হাইস্কুলে পড়ার সময় ইলেকট্রিক হিয়ারিং এইড ব্যবহারের চেষ্টা করেছিল। লাভ হয়নি কোনো। কারণ ওর বয়স যখন ছয় তখন শিকাগোর ড.জে. গর্ডন উইলসন ওর মাথায় একটা পাশ অপারেশন করে দেখতে পান ওর মস্তিষ্কে প্রাকৃতিক কানে শোনার ইকুইপমেন্টটিই নেই। কলেজে পড়ার শেষ সপ্তাহ (অপারেশনের আঠার বছর বাদে) এমন একটি ঘটনা ঘটল যা ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

ওকে আরেকটি ইলেকট্রিক্যাল হিয়ারিং ডিভাইস দেয়া হলো। ট্রায়াল হিসেবে ব্যবহার করবে। আগের যন্ত্রটি ওকে হতাশ করে তুলেছিল বলে ওই ডিভাইসটির বিষয়ে ওকে খুব একটা উৎসাহিত মনে হচ্ছিল না। তবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও যখন ডিভাইসটি মাথায় লাগল, সঙ্গে সঙ্গে একটি দারুণ ঘটনা ঘটে গেল। সাধারণ মানুষের মতো শুনবার সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষা ওর এক লহমায় পূর্ণ হয়ে গেল! সাধারণ মানুষের মতোই ও কানে শুনতে পেতে লাগল।

আনন্দে আত্মহারা আমার ছেলের কাছে এ এক বদলে যাওয়া পৃথিবী। সে ছুটে গেল ফোনের কাছে। ফোন করল তার মাকে। মায়ের গলা পরিষ্কার শুনতে পেল আমার ছেলে। পরদিন সে তার ক্লাসের প্রফেসরদের বক্তব্য শুনতে পেল, জীবনে এই প্রথম! আগে শুধু শুনতে পেত ওর কানের কাছে মুখ এনে ওরা যখন চেঁচিয়ে কথা বলতেন তখন। জীবনে এই প্রথম মুক্তভাবে সে মিশতে পারল মানুষের সঙ্গে, তাদেরকে আর জোরে জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয় না।

শব্দের জগতকে আবিষ্কার করার আনন্দে উৎসাহিত হয়ে সে তার হিয়ারিং এইড প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছে নিজের অভিজ্ঞতা বয়ান করে একটি চিঠি লিখল। তার চিঠির মধ্যে নিশ্চয় এমন কিছু ছিল যে কোম্পানি তাকে তাদের নিউইয়র্কের অফিসের আমন্ত্রণ জানাল।

ওখানে পৌঁছালে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো কারখানায়, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে নিজের অভিজ্ঞতা বলার সময় ওর মাথায় একটি আইডিয়া চলে এল। তার মনে হলো সে যদি তার বদলে যাওয়া পৃথিবীর গল্প সেই বধির মানুষগুলোকে বলতে পারে যারা হিয়ারিং এইড ব্যবহার করে না, তাহলে হয়তো তাদের উপকার হতে পারে। সে এদের কাছে হিয়ারিং এইড ব্যবহারের সুফলগুলো তুলে ধরবে।

গোটা একটা মাস সে প্রগাঢ় গবেষণা চালাল, এ সময়ে সে হিয়ারিং এইড

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটির পুরো মার্কেটিং সিস্টেম বিশ্লেষণ করল এবং বিশ্বজুড়ে বধির মানুষের সঙ্গে নিজের নব আবিস্কৃত 'পরিবর্তিত পৃথিবী' নিয়ে যোগাযোগের রাস্তা বের করে ফেলল। এ কাজ করার পরে সে নিজের আবিস্কৃত তথ্যাদির ওপরে ভিত্তি করে দুই বছরের একটি পরিকল্পনা ফাঁদল। সে যখন কোম্পানির কাছে পরিকল্পনাটি পেশ করল সঙ্গে সঙ্গে তারা ওকে একটি চাকরি দিয়ে দিল যাতে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

হিয়ারিং এইড কোম্পানির চাকরি পাবার কিছুকাল পরে ও আমাকে ওদের কোম্পানি আয়োজিত একটি ক্লাসে আমন্ত্রণ জানাল যেখানে কালা ও বোবা মানুষদেরকে কানে শোনার ও মুখে বুলি ফোটানোর ব্যবস্থা করা হয়। আমি এরকম শিক্ষার কথা কোনোদিন শুনিনি তাই ওই ক্লাসে গেলাম একটু সন্দেহ এবং আশা নিয়ে। আশা এ কারণে যে আমার সময়টা বৃথা যাবে না। এখানে একটি ডেমোনেস্ট্রেশন দেখলাম যা আমাকে একটি বৃহৎ অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান দিল যে আকাঙ্ক্ষাটি আমি আমার সন্তানের জন্য করেছিলাম যাতে সে সাধারণভাবে শুনতে পায়। কুড়ি বছর আগে যে পদ্ধতি আমি আমার ছেলের জন্য ব্যবহার করেছিলাম ঠিক একইভাবে এখানকার বোবা-কালাদের শেখানো হচ্ছে।

আমার মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে আমার ছেলে ব্লেয়ার সারাজীবন বধিরই থেকে যেত যাদি না আমি এবং ওর মা ওর মনটিকে আমাদের মতো করে গড়ে তুলতাম। ওর জন্মের সময় ডাক্তার নিশ্চিত করেই বলেছিলেন আমার ছেলে কোনোদিন কথা বলতে পারবে না, কানেও শুনবে না। কয়েক সপ্তাহ আগে এ ধরনের কেস বিশেষজ্ঞ ডা. আর্ভিং ভুরহিস ব্লেয়ারকে আগাগোড়া পরীক্ষা করেন। তিনি জেনে অবাক হন আমার ছেলে এখন কত চমৎকার করে শুনতে পায় এবং কথা বলতে পারে। যদিও তাঁর পরীক্ষায় বলা হয়েছিল 'তত্বগতভাবে ছেলেটি একদমই কানে শুনতে পাবে না।' কিন্তু আমার ছেলে কানে শুনতে পায় যদিও এক্স-রে করে দেখা গেছেই তার খুলিতে এমন কোনো দরজা বা উন্মুক্ত স্থান তৈরি হয়নি যার সাহায্যে কানের কথা মস্তিষ্কে পৌছাতে পারে।

আমি ব্লেয়ারের মনে এ আকাঙ্ক্ষাটি খুব ভালভাবে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলাম যে সে শুনতে পারে, কথাও বলতে পারবে। প্রকৃতিই অলৌকিকভাবে কাজ করেছে। আমি মনে করি এটি আমার বলা কর্তব্য যে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বাসের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকলে কোনো মানুষের পক্ষেই কোনো কাজ করা

অসম্ভব নয়। ব্লেয়ারের আকাঙ্ক্ষা ছিল সে সাধারণ মানুষের মতো কানে শুনতে পাবে। এবং সে এখন তা পাচ্ছে! আসলে আকাঙ্ক্ষার শক্তি সীমাহীন। আমি আমার ছেলের মনে এই আকাঙ্ক্ষা প্রোথিত করে দিয়েছিলাম যাতে সে তার প্রতিবন্ধকতাকে সম্পদে পরিণত করতে পারে। এই অসাধারণ ফলাফল প্রাপ্তির জন্য যে সাধন পদ্ধতি বা কার্যপ্রণালি ছিল তা বর্ণনা করা কঠিন কিছু নয়। এতে ছিল তিনটি সুনির্দিষ্ট বিষয়: প্রথমত, আমি আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসের মিশেল দিয়ে তা আমার ছেলের কাছে পৌঁছে দিই এই বলে যে সে স্বাভাবিকভাবে কানে শুনতে পাবে। দ্বিতীয়ত, যতভাবে, যত উপায়ে সম্ভব আমার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলাম। আমি এ বিষয়ে টানা লেগেছিলাম। তৃতীয়ত, ও আমার ওপর আস্থা রেখেছিল!

লোকে কীভাবে আকাঙ্ক্ষার শক্তি ব্যবহার করতে পারে? এ প্রশ্নের জবাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আগামী অধ্যায়গুলোতেও এ সম্পর্কে আরো আলোচনা করা হবে। আমার এক পরিচিত লোক বেশ কয়েক বছর আগে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাকে অপারেশন কক্ষে নিয়ে যাওয়ার সময় তার অতি ক্ষীণ স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম, এ কী করে অপারেশনের ধকল সামলাবে? মনে হয় টিকবে না। ডাক্তাদেরও একই অভিমত ছিল। কিন্তু অপারেশন কক্ষে প্রবেশের সময় ওই লোকটি আমাকে বলেছিল, বস, চিন্তা করবেন না। আমি ঠিকই সুস্থ হয়ে ফিরে আসব।' এবং তা-ই ঘটেছিল। তার ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন, বেঁচে থাকার তীব্র কামনাই তাকে এ যাত্রা রক্ষা করেছে। সে যদি মৃত্যু চিন্তায় কাতর থাকত তাহলে কিছুতেই বাঁচতে পারত না।' দেখলেন তো ইচ্ছাশক্তি, আকাঙ্ক্ষার কত ক্ষমতা?

এরকম বহু লোককে আমি দেখেছি প্রবল আকাঙ্ক্ষার কাছে পরাভব মেনেছ স্বয়ং মৃত্যু!

পাঁচ

বিশ্বাস

আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধি ও দর্শনের জন্য বিশ্বাস

ধনী হওয়ার দ্বিতীয় পদক্ষেপ

মনের প্রধান রসায়নটির নাম বিশ্বাস। বিশ্বাস যখন মনের কম্পনের সঙ্গে মিশে যায়, অবচেতন মন সঙ্গে সঙ্গে কম্পনটি তুলে নেয়, একে পরিণত করে আত্মিক সমর্থকে এবং প্রার্থনার কাম একে অসীম বুদ্ধিমত্তায় স্থানান্তর ঘটায়।

বিশ্বাস, প্রেম এবং সেক্স সকল ইতিবাচক আবেগের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আবেগ। এ তিনটি যখন একত্রে মিলেমিশে যায়, এদের ভেতরে চিন্তার কম্পনের রঙের প্রভাব পড়ে এমনভাবে যে এটি তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে যায় অবচেতন মনের দ্বারে, যেখানে এটির স্পিরিচুয়াল একইভ্যামেন্টে পরিবর্তন ঘটে, এটি একমাত্র গঠন যা অসীম বুদ্ধিমত্তাকে উৎপাদিত করে।

প্রেম এবং বিশ্বাস হলো সাইকিক বা মানসিক, এটি মানুষের আধ্যাত্মিক বা আত্মিক দিকটির সঙ্গে সম্পর্কিত। সেক্স হলো পুরোটাই বায়োলজিকাল বা শারীরিক, শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই তিনটি আবেগের মিশ্রণ সসীম, মানুষের চিন্তা চেতনা এবং অসীম বুদ্ধিমত্তার একটি সরাসরি যোগাযোগের লাইন খুলে দেয়।

কীভাবে বিশ্বাস গড়ে তুলবেন

যার মনে বিশ্বাস বস্তুটাই নেই তার ভেতরে বিশ্বাস উৎপাদন করা খুবই কঠিন কাজ। তাকে বিশ্বাস কী জিনিস বোঝানোই মুশকিল। এ যেন এক অন্ধ লোককে লাল রঙ বোঝানোর চেষ্টা যে কোনোদিন রঙ দেখেনি। বিশ্বাস হলো সেই মানসিক অবস্থা যাকে আপনি ইচ্ছে করলেই মনের ভেতরে গড়ে তুলতে পারেন। আর এটা সম্ভব সেই তেরোটি তত্ত্বে দক্ষতা অর্জনের পরে।

মনে রাখবেন সকল চিন্তাভাবনা যার সঙ্গে জড়িত আবেগ এবং বিশ্বাস, তারা নিজেদেরকে ফিজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্টের মধ্যে মিশিয়ে দেয়। আবেগ বা অনুভূতি চিন্তারই অংশ, এই ফ্যাক্টরগুলো চিন্তাকে দেয় প্রাণশক্তি, জীবন এবং অ্যাকশন। চিন্তার আবেগের সঙ্গে যখন মিশ্রিত থাকে বিশ্বাস, তাতে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক যেরকম ইমোশনই থাকনা কেন তা অবচেতন মনকে প্রভাবিত করে তুলতে পারে।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। এক লক্ষ মানুষ আছে যাদের জীবনে খারাপ কিছু ঘটলে ভাবে, এটি তাদের 'দুর্ভাগ্য' কিংবা এরকমটাই তাদের 'কপালে লেখা ছিল'। তারা বলে নিয়তির ওপর তাদের হাত নেই। কাজেই যা ঘটবার তা ঘটবেই। এরা আসলে তাদের দুর্ভোগ্যের জন্য নিজেরাই দায়ী, নিজেরাই তৈরি করে দুর্ভোগ। কারণ নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা মনে স্থান দিলে অবচেতন মন তা লুফে নেয় এবং তাকে শারীরিক সমার্থকে পরিণত করে।

মন এমন একটি জায়গা যেখানে আপনি হুকুম দিয়ে নিজের উপকার করতে পারবেন। অবচেতন মনকে কথাগুলো শোনাতে হবে, আপনার যে কোনো আকাঙ্ক্ষা, যাকে আপনি শারীরিক বা আর্থিক সমতুল্যতায় রূপান্তর ঘটাতে চান, তাতে যদি পুরোপুরি বিশ্বাস থাকে, তাহলে এর বাস্তবায়ন অবশ্যই ঘটবে। আপনার বিশ্বাস বা আস্থা হলো সেই উপাদান যা আপনার অবচেতন মনের অ্যাকশনকে প্রত্যয়ী করে তোলে। অটো সাজেশনের মাধ্যমে নির্দেশ দিলে আপনার অবচেতন মন কোনোকিছু বিলম্বিত করতে পারবে না।

অটোসাজেশনের মাধ্যমে আপনি আপনার মনে সহজেই গড়ে তুলতে পারবেন বিশ্বাস। নিচে যে অটোসাজেশনগুলো দেয়া হলো তা আপনি এক, দুই, তিন, চারবার পড়বেন। এবং জোরে জোরে পাঠ করবেন।

বিশ্বাস হলো সকল সমৃদ্ধির শুরুর কেন্দ্রবিন্দু।

বিশ্বাস হলো সকল 'অলৌকিকতা'র এবং সমস্ত রহস্যের ভিত্তি যা বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্বাসই হলো ব্যর্থতার একমাত্র প্রতিষেধক।

বিশ্বাস হলো সেই উপাদান বা 'কেমিক্যাল' যা যখন প্রার্থনার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখন অসীম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ঘটিয়ে ফেলে।

বিশ্বাস হলো এমন এক উপাদান যা চিন্তার সাধারণ কম্পনকে গঠন করে মানুষের সসীম মনের সাহায্যে এবং তাকে আত্মিক সমতুল্যতা এনে দেয়।

বিশ্বাস হলো একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে অসীম বুদ্ধিমত্তার কসমিক ফোর্সকে মানুষ ব্যবহার করতে পারে।

আত্মবিশ্বাসের ফর্মূলা

১. আমি জানি আমার জীবনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ করার ক্ষমতা আমার রয়েছে। তাই আমি হুকুম করছি নিজেকে অনড় থাকতে যাতে আমি এগুলো অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারি এবং শপথ করছি এর বিনিময়ে আমি নিশ্চয় কিছু দেব।

২. আমি বুঝতে পারছি আমার মনের কর্তৃত্বপরায়ণ চিন্তা-ভাবনাগুলো অবশেষে ফিজিক্যাল অ্যাকশনে পরিণত হবে এবং ক্রমে এগুলো শারীরিক বাস্তবতায় মোড় নেবে, এ কারণে আমি প্রতিদিন ত্রিশ মিনিট করে আমার চিন্তাভাবনাগুলোর ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব, ভাববো আমি আসলে কী হতে চাইছি এবং ওই মানুষটির একটি পরিষ্কার ছবি ফুটিয়ে তুলব মনের মধ্যে।

৩. অটো-সাজেশনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমি জানি আমি আমার মনের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা পুষে রেখেছি তা অবশেষে কিছু অভিব্যক্তির মাধ্যমে আমার আরাধ্য বস্তুটির ছবি ফুটিয়ে তুলবে এবং আমি প্রতিদিন দশ মিনিট করে আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য নিজেকে উৎসর্গিত করব।

৪. আমি আমার জীবনের সুনির্দিষ্ট মূল লক্ষ্য এর কথা পরিষ্কারভাবে একটি কাগজে লিখে রেখেছি এবং এটি অর্জনের জন্য যতদিন পর্যন্ত না আমার মনে যথেষ্ট পরিমাণ আত্মবিশ্বাস জন্মায় ততদিন পর্যন্ত এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকব না।

৫. আমি পরিষ্কার জানি পৃথিবীর কোনো ধনসম্পদ বা অবস্থানই চিরস্থায়ী নয় যদি না সেটি বিশ্বাস ও ন্যায় বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই আমি সেসবের জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখব না যার দ্বারা সমাজ উপকৃত হয় না। আমি যে শক্তি ব্যবহার করতে চাই তা নিজের কাছে টেনে আনব। আমি চাইব অন্যেরা আমার সেবা করুক আর আমিও যেহেতু অন্যদের সেবা করতে চাই তাই মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা গড়ে তুলে আমি নির্মূল করব সমস্ত ঘৃণা, ঈর্ষা, হিংসা, স্বার্থপরতা এবং নৈরাশ্যবাদ। কারণ আমি জানি অন্যদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব আমার জন্য কখনো সাফল্য বয়ে আনবে না। আমি চাইব অন্যেরা আমাকে বিশ্বাস করবে

কারণ আমি তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করব এবং নিজেকেও বিশ্বাস করব।

আমি এ ফর্মুলায় আমার নাম দস্তখত করব, এটি মনে রাখব এবং প্রতিদিন একবার করে জোরে জোরে এটি পুনরাবৃত্তি করব পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে যে এটি আমার **চিন্তা** এবং **কর্মকাণ্ডে** ক্রমে প্রভাব বিস্তার করবে যাতে আমি একজন স্বনির্ভর এবং সফল মানুষ হতে পারি।

এ ফর্মুলায় রয়েছে প্রকৃতির এমন এক আইন যা আজও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। এটি সর্বযুগে বিশ্বাসীদেরকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে। মনোবিজ্ঞানীরা এ আইনের নামকরণ করেছেন 'অটো-সাজেশন'।

যে নামেই একে অভিহিত করা হোক না কেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি মানব সভ্যতার জন্য মহিমা এবং সাফল্য নিয়ে কাজ করে যায় যদি এটিকে গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করা যায়। পক্ষান্তরে একে ধ্বংসাত্মকভাবে ব্যবহার করা হলে এ শুধু ধ্বংস সাধনই করবে। এ স্টেটমেন্ট বা বিবৃতিতে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সত্য রয়েছে আর তা হলো, যারা পরাজয় মেনে নেয় এবং নিজেদের জীবনের অবসান ঘটায় দারিদ্র্য, দুর্দশা ও দুঃখের মাঝে, এরকমটি তাদের জীবনে ঘটার কারণ তারা অটো-সাজেশনের বৈশিষ্ট্যকে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করেছে।

অবচেতন মন গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক আবেগী চিন্তাভাবনার মাঝে কোনো পার্থক্য করে না। এটি কাজ করে আমরা এটিকে যে মেটেরিয়াল খাওয়াই তার মাধ্যমে বা আমাদের চিন্তার আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে। অবচেতন মনকে ভয় দ্বারা যেমন চালিত করা যায় তেমনি সাহস ও বিশ্বাস দ্বারাও চালানো যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সাজেস্টিভ সুইসাইড এর অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মানে হলো, অনেকেই নেতিবাচক সাজেশনের বশবর্তী হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পাশ্চাত্যের একটি শহরে জোসেফ গ্রান্ট নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তা পরিচালকদের না জানিয়েই ব্যাংক থেকে বড় অংকের একটি টাকা সরিয়ে ফেলেছিল। সে জুয়া খেলে টাকাটা নষ্ট করে ফেলে। একদিন দুপুরে ব্যাংক এক্সামিনার আসে অ্যাকাউন্ট চেক করার জন্য। ওইদিন গ্রান্ট ব্যাংক থেকে বেরিয়ে স্থানীয় একটি হোটেলে একটি কামরা ভাড়া নেয়। তিনদিন পর লোকে তার সন্ধান পায় এবং দেখে সে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে, গোঙাচ্ছে আর বারবার বলছে 'মাই গড, আমি মরে যাব! আমি এই অসম্মান কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।' কিছুক্ষণ পরে সে মারা যায়। ব্যাংকের ডিরেক্টররা এই কেসটিকে 'মেন্টাল

সুইসাইড' বলে অভিহিত করেন।

বিদ্যুৎ যেমন শিল্প কারখানার চাকা ঘোরায়, যদি একে গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে সঠিক সেবা পাওয়া যায়, উল্টোটি ঘটলে জীবন নষ্ট। তেমনি অটো-সাজেশনের আইন কানুন আপনাকে নিয়ে যেতে পারে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অথবা ঠেলে ফেলে দিতে পারে দুঃখ, ব্যর্থতা এবং মৃত্যুর উপত্যকায়, পুরো ব্যাপারটিই অবশ্য নির্ভর করবে আপনি এটিকে কতটুকু বুঝতে পেরেছেন এবং কীভাবে এর ব্যবহার করছেন, তার ওপর।

আপনার মনে নিজের সামর্থ নিয়ে যদি থাকে ভয়, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস তাহলে অটো-সাজেশন আপনার এই অবিশ্বাসকে এমন একটি প্যাটার্ন বা নকশা হিসেবে ব্যবহার করবে যে আপনার অবচেতন মন সেটাকেই মূর্ত রূপ দেবে।

এ যেন সেই বাতাসের মতো যার চাপে একটি জাহাজ যায় পুবে, অপরটি পশ্চিমে। অটো-সাজেশনের আইন আপনাকে হয় ওপরে তুলে নেবে অথবা ডুবিয়ে দেবে। পুরোটাই নির্ভর করবে আপনি আপনার চিন্তার পাল কোন দিকে উড়িয়ে দিলেন তার ওপর।

অটো সাজেশনের আইন কীভাবে একজন মানুষকে তার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে নিচের কবিতাটি পড়লে তা কিছুটা বোঝা যাবে

If you think you are beaten, you are,
If you think you dare not, you don't
If you like to win, but you think you can't
It is almost certain you won't.

If you think you will lose, you're lost
For out of the world we find,
Success begins with a fellow's will
It's all is the state of mind.

If you think you are outclassed, you are,
You've got to think high to rise,
You've got to be sure of yourself before
You can ever win a Prize.

Life's battles don't always go
to the stranger or faster man.
But soon or late the man who wins

Is the man WHO THINKS HE CAN!

কবিতাটির শব্দগুলো খেয়াল করুন যেগুলোর ওপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে তাহলে এ কবিতার গূঢ়ার্থ অনুধাবন করতে পারবেন।

আপনার মস্তিষ্কের কোথাও, সম্ভবত কোষের মাঝে অর্জনের বীজ ঘুমিয়ে আছে। ওটিকে জাগিয়ে তুলে কাজে নেমে পড়ুন। ওটি আপনাকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যাবে যা আপনি কখনো আশাই করেননি।

আব্রাহাম লিংকন শুরুর দিকে যাতেই হাত দিয়েছেন, ব্যর্থ হয়েছেন। চল্লিশের আগে তিনি সাফল্যের দেখা পাননি। তাঁকে কেউ চিনত না, তারপর একদিন তাঁর একটি দারুণ অভিজ্ঞতা হলো, তাঁর মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের ভেতরকার ঘুমন্ত প্রতিভা জেগে উঠল এবং পৃথিবী উপহার পেল এক অসাধারণ মানুষকে। ওই অভিজ্ঞতায় দুঃখ এবং প্রেমের মিশ্রণ ছিল। এ অভিজ্ঞতার স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র প্রেমিকা অ্যানি রুটলজের কাছ থেকে।

এটি সর্বজনবিদিত যে প্রেম নামক আবেগটির সঙ্গে বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতের মহাত্মা গান্ধী কুড়ি লাখ মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন শুধু ভালোবাসা দিয়ে। লোকে তাঁকে পাগলের মতো বিশ্বাস করত। গান্ধীর বাড়ি, গাড়ি, অর্থ কিছুই ছিল না, এমনকী দামী পোশাক পরিচ্ছদও নয়। কিন্তু তাঁর ছিল শক্তি। কীভাবে তিনি এ শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন?

তিনি এ শক্তি তৈরি করেছিলেন বিশ্বাস থেকে। আর এ বিশ্বাস তিনি প্রোথিত করেন কুড়ি লাখ মানুষের অন্তরে। আর এ বিশ্বাস দিয়ে তিনি যা যা করেছেন তা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর পক্ষেও করা সম্ভব ছিল না। তিনি বিশ্বাসের সাহায্যে কুড়ি লাখ মানুষের মনকে একই সুতোয় বেঁধে ফেলেছিলেন। বিশ্বাস ছাড়া এ কাজ করা আদৌ সম্ভব?

১৯০০ সালে ইউনাইটেড স্টেটস স্টিল কর্পোরেশন গঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন চার্লস এম. সোয়াব। একটি আইডিয়া থেকে এটি তিনি নির্মাণ করেন। আর আইডিয়াটি আসে তাঁর কল্পনা থেকে।

তিনি এ আইডিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসের মিশ্রণ ঘটান।

তারপর তিনি আইডিয়ার শরীরী রূপ দেয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা করেন।

চতুর্থত, তিনি ইউনিভার্সিটি ক্লাবে বিখ্যাত একটি বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনা অ্যাকশনে নেয়ার কথা বলেন।

পঞ্চমত, তিনি ধৈর্য সহকারে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে নেমে যান।

ষষ্ঠত, তিনি সাফল্য অর্জন করার জন্য একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষার মনের মাঝে পুষে রেখেছিলেন।

যাদের মনে সন্দেহ আছে মানুষ চিন্তা করে ধনী হতে পারে না তাদের জন্য উৎকৃষ্টতম উদাহরণ মি. সোয়াবের ইস্পাত কারখানা। তিনি ভেবেছেন, চিন্তা করেছেন, পরিকল্পনা করেছেন, ধৈর্য সহকারে লেগে থেকেছেন এবং অবশেষে সফলও হয়েছেন।

ছয়

অটো-সাজেশন

অবচেতন মনকে প্রভাবিত করার মাধ্যম

ধনী হওয়ার তৃতীয় পদক্ষেপ

অটো-সাজেশন হলো এমন একটি টার্ম যা সকল সাজেশনকে উদ্দীপিত করে তোলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষের মনে পৌঁছে দেয়। অন্যভাবে বলা যায় অটো-সাজেশন হলো সেলফ-সাজেশন। এটি হলো মনের মধ্যে যোগাযোগের একটি পন্থা যেখানে সচেতন চিন্তাভাবনাগুলো আশ্রয় নেয় এবং যা অবচেতন মনের অ্যাকশনের জন্য কাজ করে। সচেতন মনের মাঝে বিদ্যমান কর্তৃত্বপরায়ণ চিন্তাভাবনাগুলোর (এগুলো ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে) ভেতর দিয়ে অটো-সাজেশন পৌঁছে যায় অবচেতন মনের কাছে এবং এইসব ভাবনা দিয়ে তাকে প্রভাবিত করে।

কোনো চিন্তাভাবনা, হোক সেটা নেগেটিভ অথবা পজেটিভ, অটো-সাজেশনের প্রিন্সিপালের সাহায্য ছাড়া অবচেতন মনে প্রবেশ করতে পারে না।

প্রকৃতি মানুষকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে তার সেইসব মেটেরিয়ালের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যা তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার অবচেতন মনে পৌঁছে। তবে অনেক মানুষই এটি অনুশীলন করে না বলে তাদের দিন কাটে দুঃখ-দুর্দশায়।

ধরে নিন অবচেতন মন হলো একটি উর্বর বাগান যেখানে কাঙ্ক্ষিত শস্য রোপণ না করা হলে ভরে উঠবে আগাছায়। অটো-সাজেশন হলো নিয়ন্ত্রণের একটি মাধ্যম যার সহায়তায় যে কেউ অবচেতন মনে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা প্রবেশ করাতে পারে অথবা একে অগ্রাহ্য করে ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির চিন্তা প্রবেশের অনুমতি দিতে পারে আপনার মনের সমৃদ্ধ বাগানে। আকাঙ্ক্ষা নামক অধ্যায়টিতে যে ছয়টি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তার লিখিত স্টেটমেন্ট আপনাকে দিনে দুইবার করে জোরে জোরে পাঠ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে, যেখানে অর্থের জন্য

আপনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হবে, আপনি দেখবেন এবং অনুভব করবেন যে আপনি কাঙ্ক্ষিত অর্থের মালিক বনে গেছেন। এই নির্দেশগুলো মেনে চলে আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষা'র অভীষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে অবচেতন মনের সরাসরি যোগাযোগ ঘটাবেন যার ভিত্তিমূলে রয়েছে পরিপূর্ণ বিশ্বাস।

আকাঙ্ক্ষার অধ্যায়ে ফিরে যান যেখানে ছয়টি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। সামনে এগোবার আগে এগুলো অত্যন্ত সাবধানে আবার পাঠ করুন। এভাবে বারবার পাঠ করলে আপনার অবচেতন মন এগুলো গ্রহণ করবে এবং সে অনুযায়ী কাজও করবে।

এ বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ই বারবার পাঠ করে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। কারণ আপনি যদি বিষয়টি বুঝতে না পারেন, সামনে এগোবেন কী করে। আর বুঝতে না পেরে যারা অটো-সাজেশনের সূত্রগুলো অনুসরণ করতে যায় তারা আসলে কিছুই লাভ করতে পারে না।

সাদামাটা, আবেগহীন শব্দাবলী অবচেতন মনে কোনো প্রভাব তৈরি করতে পারে না। মনে বিশ্বাস না থাকলে অবচেতন মনে আপনি আপনার ভাবনাগুলো যথাযথভাবে প্রেরণ করতে পারবেন না।

প্রথমবারে যদি আপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ কিংবা পরিচালনা করতে না পারেন, হতাশ হবেন না। মনে রাখবেন কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না। অর্থাৎ পরিশ্রম না করলে কিছুই পাবেন না। অবচেতন মনের কাছে পৌঁছা, তাকে প্রভাবিত করা, সবকিছুরই একটা মূল্য আছে। **এবং সেই মূল্যটি আপনাকে শোধ করতেই হবে।**

কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করলে তা নিয়ে ঠগবাজি করতে যাবেন না। কম মূল্যে কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত সামর্থ্যের উন্নতি করা সম্ভব নয়। আপনি, একমাত্র আপনার নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি যার জন্য ক্ষুধার্ত তার জন্য কিছু দেবেন কী দেবেন না।

অটো-সাজেশনের মূলসূত্রে বা প্রিন্সিপাল ব্যবহার করা নির্ভর করবে আপনি কাঙ্ক্ষিত কোনো কিছুর ওপর কতটুকু মনোযোগ দিতে পারছেন এবং সেই আকাঙ্ক্ষাটি যতক্ষণ পর্যন্ত না তীব্র অবসেশনে পরিণত হয়। আপনি যখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ছয়টি পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িত নির্দেশগুলো পালন শুরু করবেন, তখন মনোযোগের সূত্রগুলো ব্যবহার করাও আপনার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

মনোযোগের কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দেয়া যাক। আপনি যখন ছয়টি পদক্ষেপের প্রথমটি অনুসরণ করতে যাবেন, যেখানে আপনাকে নির্দেশ

দেয়া হয়েছে 'আপনি ঠিক কী পরিমাণ টাকা চাইছেন তা আগে মনে মনে ঠিক করে নিন' সেখানে আপনি টাকার পরিমাণের ওপর নিজের চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করুন, চোখ বুজে দেখার চেষ্টা করুন সেই পরিমাণ অর্থ। এ কাজটি প্রতিদিন অন্তত: একবার করুন। এ অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার সময় বিশ্বাস-এর অধ্যায়ে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অনুসরণ করুন এবং দেখুন যে ঠিক ওই পরিমাণ টাকার মালিক আপনি বনে গেছেন।

একটি কথা মনে রাখতে হবে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে যে আদেশ করা হয় তা কিন্তু অবচেতন মন মেনে নেয় এবং সে সেই আদেশ অনুসারে কাজ করে। যদিও এরকম আদেশ দিতে হবে বারংবার। অবচেতন মনকে এ কথায় বিশ্বাস করাতে হবে কারণ আপনি নিজে এটি বিশ্বাস করেন যে আপনি কল্পনায় যে বিপুল পরিমাণ টাকা দেখছেন তা আপনার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে, অবচেতন মন ওই টাকা পাবার জন্য অবশ্যই আপনাকে পথ বাতলে দেবে।

নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। মনে কোনো পরিকল্পনা এলেই তা নিয়ে লেগে পড়ুন কাজে। এরকম পরিকল্পনা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আপনার মনে চলে আসতে পারে 'অনুপ্রেরণা'র আকারে। এ অনুপ্রেরণাকে অসীম বুদ্ধিমত্তার কোনো ডাইরেক্ট টেলিগ্রাম কিংবা মেসেজও বলা চলে। একে সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করুন এবং পাওয়া মাত্র একে নিয়ে কাজে লেগে যান। ব্যর্থ হলে তা আপনার সাফল্যের জন্য ভয়ানক হয়ে উঠবে।

ছয়টি পদক্ষেপের চার নম্বরে বলা হয়েছে 'আপনারা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং পরিকল্পনা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ুন কাজে।' আপনাকে এ নির্দেশটি মানতে হবে।

নির্দেশনাবলীর সারাংশ

এ বইটি আপনি পড়ছেন কারণ আপনি জ্ঞান আহরণ করতে চান। এটি আরো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আপনি এ বিষয়ের একজন ছাত্র। আপনি যদি শুধু ছাত্রই হন, সুযোগ থাকে আপনি যা জানেন না তা করতে পারবেন। তবে যেসব নির্দেশ বা পরামর্শ দেয়া হবে তা যদি আপনি অবহেলা করেন কিংবা অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানান তাহলে আপনি ব্যর্থ হবেন। সন্তোষজনক ফলাফল পেতে হলে বিশ্বাস নিয়ে সকল নির্দেশ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে ছ'টি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তার সারাংশ এখানে দেয়া হলো, সঙ্গে এ অধ্যায়ের কিছু অংশও মিশ্রণ ঘটানো হলো। যেমন:

১. কোনো নির্জন জায়গায় চলে যান (রাতের বেলা বিছানা সবচেয়ে ভালো) যেখানে কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। চোখ বন্ধ করুন এবং জোরে জোরে বলুন (যাতে আপনি নিজে শুনতে পান, সেই লিখিত স্টেটমেন্ট থেকে যেখানে আপনি কত টাকা আয় করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন)। ওখানে লেখা আছে ওই পরিমাণ টাকা কতদিনে উপার্জন করবেন। আপনি এই নির্দেশগুলো পাঠ করার সময় দেখবেন ওই পরিমাণ টাকা পেয়ে গেছেন। আপনি বলবেন, 'আমি বিশ্বাস করি এই পরিমাণ টাকা আমি পাব। আমার বিশ্বাস এতটাই প্রবল যে আমি এ পরিমাণ টাকা নিজের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, আমি হাত দিয়ে টাকাটা স্পর্শ করতে পারছি। এটি এখন আমার কাছে চলে আসার জন্য অপেক্ষা করছে।'

২. এই প্রোগ্রামটি রাতদিন সমানে চালিয়ে যান যতক্ষণ পর্যন্ত না কল্পনায় টাকাটা দেখতে পাচ্ছেন।

৩. আপনার এ স্টেটমেন্ট বা বিবৃতির একটি লিখিত কপি এমন জায়গায় রাখবেন যেটি রাতে এবং সকালে আপনার চোখে পড়ে যায়। রাতে ঘুমাবার আগে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে এটি পাঠ করবেন।

মনে রাখবেন, আপনি যখন এই নির্দেশনাগুলো মেনে চলছেন তখন কিন্তু অটো-সাজেশনের নিয়মগুলো প্রয়োগ করছেন যাতে এ আদেশগুলো আপনার অবচেতন মনে পৌঁছে যায়। এ কথাও স্মরণে রাখবেন, আপনার অবচেতন মন

কেবলমাত্র আবেগ নির্ভর নির্দেশাবলী নিয়ে কাজ করবে যাতে অনুভূতি থাকবে। আর **বিশ্বাস** হলো সবচেয়ে শক্তিশালী এবং উৎপাদনশীল অনুভূতি।

শুরুতে এ নির্দেশগুলো মনে হবে বিমূর্ত। তবে তা নিয়ে বিচলিত হবেন না। শুরুতে যতই বিমূর্ত লাগুক না কেন নির্দেশগুলো মেনে চলুন। তবে কিছুদিন পরে এগুলো আর বিমূর্ত মনে হবে না।

মানুষের ধর্মই হলো সকল নতুন আইডিয়াকে সন্দেহের চোখে দেখা। তবে আপনি যদি নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, সন্দেহ দূর হয়ে গিয়ে সেখানে জায়গা করে নেবে বিশ্বাস। এবং একটা পর্যায়ে আপনি মন থেকে বলতে পারবেন, 'আমি আমার নিয়তির নিয়ন্ত্রক, আমি আমার আত্মার চালক।'

অনেক দার্শনিকই এ কথাটি বলেছেন যে, মানুষ তার নিয়তির নিয়ন্ত্রক। তবে কেন সে প্রভু সেই ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। মানুষ নিজেই নিজের প্রভু হতে পারে কারণ **সে তার নিজের অবচেতন মনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে**। আর এর সাহায্যে অসীম বুদ্ধিমত্তার সহযোগিতা লাভ করে।

আপনি এখন যে অধ্যাটি পড়ছেন তাতে এই দর্শনটির প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ অধ্যায়ে যেসব উপদেশ বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা আপনাকে বুঝতে হবে এবং তা প্রয়োগ করার জন্য নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকতে হবে।

গোটা বইটি পাঠ শেষে এই অধ্যায়ে ফিরে আসুন এবং নিচের নির্দেশটি অনুসরণ করুন:

গোটা অধ্যায়টি প্রতি রাতে জোরে জোরে পড়বেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে অটো-সাজেশনের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পূর্ণই যুক্তিসঙ্গত যার সাহায্যে আপনার সমস্ত চাওয়া মিটবে। পড়ার সময় যে লাইনগুলো আপনার মনে ছাপ ফেলেছে সেগুলো পেন্সিল দিয়ে আন্ডারলাইন করুন।

সাত

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা পর্যবেক্ষণ

ধনী হওয়ার চতুর্থ পদক্ষেপ

জ্ঞানের ধরন দুই প্রকার। একটি হলো সাধারণ জ্ঞান, অপরটি বিশেষায়িত। সাধারণ জ্ঞান যত ব্যাপকই হোক না কেন কিংবা তাতে বৈচিত্র্য থাকুক, অর্থ উপার্জনে এর কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অর্থকরির পরিমাণ কিন্তু বেশি নয়। তাঁরা বিশেষায়িত জ্ঞান নিয়ে শিক্ষা দেন কিন্তু তাঁরা প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন না অথবা এ জ্ঞানের ব্যবহারও করেন না।

জ্ঞান যদি সুবিন্যস্ত না হয় এবং অর্থ উপার্জনের জন্য কোনো বাস্তব অ্যাকশন প্ল্যান না থাকে তাহলে সেই জ্ঞান দিয়ে টাকা আনা যায় না। এ বিষয়টি বুঝতে অক্ষম লাখ লাখ মানুষ বোকার মতো ভাবে 'জ্ঞানই শক্তি' আসলে তা নয়। জ্ঞান স্রেফ সম্ভাব্য একটি শক্তি মাত্র। এটি তখনই শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যখন সুনির্দিষ্ট অ্যাকশন প্ল্যান দ্বারা এটি সুবিন্যস্ত হয় এবং এর একটি নির্দিষ্ট সমাপ্তি থাকে।

'Education' কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'educo' থেকে। এর অর্থ অভ্যন্তরীণ উন্নতি। একজন শিক্ষিত মানুষ তিনি নন যার প্রচুর সাধারণ এবং বিশেষায়িত জ্ঞান রয়েছে। একজন শিক্ষিত মানুষ তিনি যিনি তার মনের শক্তির এতটাই উন্নয়ন ঘটিয়েছেন যে তিনি যা চান তা-ই পেতে পারেন অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে। হেনরি ফোর্ড এই সংজ্ঞার আলোকে একজন শিক্ষিত মানুষ যদিও তাঁর অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা ছিল খুবই কম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শিকাগোর একটি সংবাদপত্র তাদের একটি এডিটরিয়ালে হেনরি ফোর্ডকে 'an ignoraut Pacifist' বলে সম্বোধন করে। মি. ফোর্ড তার তীব্র প্রতিবাদ করে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলা আদালতে উঠলে অ্যাটর্নিরা কাগজটির জন্য জাস্টিফিকেশনের আর্জি জানায় এবং

মি. ফোর্ডকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়া করায় জুরিদের কাছে এ কথা প্রমাণ করতে যে তিনি একজন অজ্ঞ মানুষ। অ্যাটর্নিরা মি. ফোর্ডকে নানারকম প্রশ্ন করে এটাই প্রমাণ করার জন্য যে গাড়ি নির্মাণে তাঁর বিশেষায়িত জ্ঞান থাকতে পারে বটে আসলে তিনি একজন অজ্ঞ মানুষ।

মি. ফোর্ডকে যেসব প্রশ্ন হয়েছিল তার খানিকটা উদাহরণ নিম্নরূপ:

'বেনেডিক্ট আরনল্ড কে ছিলেন?' এবং '১৯৭৬ সালের বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশরা আমেরিকায় কী পরিমাণ সৈন্য পাঠিয়েছিল?'

শেষ প্রশ্নের জবাবে মি. ফোর্ড বলেন, 'ব্রিটিশরা ঠিক কতজন সৈন্য পাঠিয়েছিল সংখ্যাটি আমি জানি না তবে শুনেছি পরিমাণটি বেশ বড়ই ছিল'

এ ধরনের প্রশ্ন শুনে শুনে এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন মি. ফোর্ড, এবং একটি বিশেষ আক্রমণাত্মক প্রশ্নের জবাবে তিনি প্রশ্নকর্তা আইনজীবীর দিকে আঙুল তুলে বলেন, 'আপনি আমাকে এইমাত্র যে নির্বোধ প্রশ্নটি করলেন কিংবা এতক্ষণ ধরে যেসব প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমার ডেস্কে এক সারি বৈদ্যুতিক পুশ-বাটন রয়েছে এবং সঠিক বোতামটি টিপলেই আমি আমার সহকারীদেরকে ডাকতে পারি এবং তাদেরকে আমার ব্যবসা সংক্রান্ত যে ব্যবসায় আমি সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছি, সে বিষয়ে যে কোনো প্রশ্ন করলেই তারা তার জবাব দিতে পারবে। এখন কি আপনি অনুগ্রহ করে বলবেন আমি কেন আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য সাধারণ জ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব যেখানে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাবার জন্য আমার চারপাশেই নিজের লোক রয়েছে?'

আদালতের প্রত্যেকে অনুধাবন করতে পারেন এটি কোনো অজ্ঞ লোকের জবাব নয়, একজন শিক্ষিত মানুষের উত্তর। সে-ই শিক্ষিত যে জানে প্রয়োজনে কোত্থেকে জ্ঞান আহরণ করা যাবে এবং ওই জ্ঞান নির্দিষ্ট প্ল্যান অব অ্যাকশনে কাজে লাগানো যাবে। হেনরি ফোর্ড তাঁর 'মাস্টার মাইন্ড' দলটির সাহায্যে সমস্ত বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন করতেন এবং তা কাজে লাগিয়ে তিনি আমেরিকার অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। ওই সব জ্ঞান তাঁর মস্তিষ্কে থাকার প্রয়োজন ছিল না।

আপনি অর্থ উপার্জনে আপনার সামর্থ আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করার আগে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন করে নেবেন। এটি অর্জন করার জন্য হয়তো আপনার অধিক পরিমাণ বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে। আর সেক্ষেত্রে

আপনাকে সাহায্য করতে পারে আপনার ‘মাস্টার মাইন্ড’ গ্রুপ।’

এন্ড্রু কার্নেগি স্বীকার করেছিলেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইস্পাত ব্যবসার টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো কিছুই বুঝতেন না। আর জানার খুব যে একটা আগ্রহ ছিল তা-ও নয়। তিনি ইস্পাত ম্যানুফ্যাকচার এবং মার্কেটিংয়ের জন্য যে বিশেষায়িত জ্ঞানটুকু অর্জন করেছিলেন তা পুরোটাই তাঁর মাস্টার মাইন্ড গ্রুপের কাছ থেকে।

বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হতে হলে **পাওয়ার** দরকার। আর এই পাওয়ার বা শক্তি অর্জিত হয় সুসংগঠিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত বিশেষায়িত জ্ঞান থেকে। তবে এ জ্ঞান একজন মানুষের মধ্যে যে থাকতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই।

এ লেখাটি পাঠকের মনে হয়তো আশা এবং সাহস যুগিয়ে তুলবে যারা সম্পদের মালিক হতে চান কিন্তু বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ‘শিক্ষা’ লাভ করতে পারেননি। ‘শিক্ষা’ লাভ করতে না পারার হীনমন্যতায় অনেকেই ভোগেন। তবে যে মানুষ টাকা বানাতে একদল লোককে নিয়ে ‘মাস্টার মাইন্ড’ দল সৃষ্টিতে সক্ষম এবং তাদেরকে পরিচালনাও করতে জানেন, তিনি ওই দলের যে কোনো মানুষের মতোই শিক্ষিত। একটি কথা মনে রাখবেন আপনি যদি হীনমন্যতায় ভোগেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার স্কুলিংয়ে সীমাবদ্ধতা ছিল।

টমাস আলভা এডিসন সারা জীবনে মাত্র তিন মাস ‘স্কুলিং’-এর সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষার অভাব ছিল না এবং গরীবী হালেও তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়নি। হেনরি ফোর্ড ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন কিন্তু তিনি আর্থিকভাবে নিজেকে দারুণভাবে গড়ে তুলেছিলেন।

সফল মানুষরা তাঁদের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য পূরণে কখনো বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনে পিছ পা হন না। যারা অসফল তারা ভাবে অ্যাকাডেমিক পড়ালেখা খতম করলেই বুঝি সমস্ত জ্ঞান আহরণ হয়ে গেল। সত্যি কথা এই যে স্কুলিং বা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে বাস্তব জ্ঞান খুব কমই অর্জন করা যায়।

আট

কল্পনা শক্তি

মনের কর্মশালা

ধনী হওয়ার পঞ্চম পদক্ষেপ

কল্পনাকে আক্ষরিক অর্থেই মনের ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা বলা চলে যেখানে মানুষ সবরকমের পরিকল্পনা সৃষ্টি করে। বলা হয় মানুষ যা কল্পনা করে তার সবকিছুই সে সৃষ্টি করতে পারে।

কল্পনা শক্তির দ্বারা মানুষ কত কিছুই না আবিষ্কার করেছে। সে আকাশকে জয় করেছে। সে বাতাসকে জয় করেছে। ইথারের মাধ্যমে এখন সারা পৃথিবীতে পৌঁছে যাচ্ছে খবর। (এ বই ১৯৩০-এর দশকে রচিত। তখন সবে এরোপ্লেন এবং রেডিও আবিষ্কার হয়েছে যা আজ থেকে প্রায় ৮৬ বছর আগে– অনুবাদক) সে লক্ষ কোটি মাইল দূরের সূর্যের ওজন পরিমাপ করছে, তাকে বিশ্লেষণ করছে। সবকিছুই সম্ভব হয়েছে কল্পনার সাহায্যে। মানুষ আবিষ্কার করেছে তার নিজের মস্তিষ্কই চিন্তার কম্পন আদান-প্রদানের একটি স্টেশন এবং এখন শিখছে কীভাবে এ আবিষ্কারের বাস্তব ব্যবহার করা যায়। সে গাড়ির গতি বৃদ্ধি করেছে, এখন সে ঘণ্টায় তিনশো মাইলেরও বেশি স্পিডে চলতে সক্ষম।

এমন একটা সময় আসবে যখন লোকে নাশতা করবে নিউইয়র্কে, লাঞ্চ খাবে স্যান ফ্রান্সিসকোয় (১৯৩০ এর দশকের বাস্তবতায় এটি তখন স্রেফ কল্পনা হলেও এখন আর সে কল্পনা নয়, পাঠক জানেন!– অনুবাদক)।

মানুষের একমাত্র সীমাবদ্ধতা হলো কল্পনা শক্তির ব্যবহার এবং তার উন্নয়ন। কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নতির শীর্ষে এখনও সে পৌঁছাতে পারেনি। তার যে কল্পনা শক্তি রয়েছে এবং তা যে প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করা চলে সে বিষয়টি সে মাত্রই আবিষ্কার করেছে।

কল্পনার দুটি রূপ

কল্পনার দুটি রূপ। একটি 'সিনথেটিক ইমাজিনেশন' বা সংশ্লেষী কল্পনা এবং অপরটি 'ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন' বা সৃজনশীল কল্পনা।

সংশ্লেষী কল্পনা এ কল্পনা শক্তির সাহায্যে লোকে পুরানো ধ্যান ধারণা, আইডিয়া কিংবা পরিকল্পনাকে নতুন কম্বিনেশন বা সংযুক্তিতে যুক্ত অথবা মিশ্রণ ঘটাতে পারে। তবে এ শক্তি বা ক্ষমতাটি কিছুই সৃষ্টি করে না। এ অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ নিয়ে কাজ করে যা এই কল্পনার মাঝে প্রবেশ করানো হয়। এ শক্তি বেশিরভাগই ব্যবহার করে থাকেন আবিষ্কর্তারা, তবে দু'একজন ব্যতিক্রমীও রয়েছেন যারা সৃজনশীল কল্পনা নিয়ে কাজ করেন যখন তিনি সংশ্লেষী কল্পনা দিয়ে নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারেন না, তখন।

সৃজনশীল কল্পনা সৃজনশীল কল্পনা শক্তির সাহায্যে মানুষের অসীম মনের সঙ্গে অসীম বুদ্ধিমত্তার সরাসরি সংযোগ ঘটে। এ শক্তির সাহায্যে 'অনুমান' অনুপ্রেরণা' ইত্যাদি বিষয়গুলো মনের মধ্যে রিসিভ করা হয়। এ শক্তির দ্বারাই সকল বেসিক কিংবা নতুন আইডিয়াগুলো দেয়া হয় মানুষকে।

এই শক্তি বা ক্ষমতার সাহায্যে মনের অন্যান্য চিন্তার কম্পন রিসিভ করা হয়। এর সাহায্যেই অন্য মানুষের অবচেতন মনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব।

সৃজনশীল কল্পনা কাজ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং ফিন্যান্সের মহারথীসহ প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক, কবি এবং লেখকরা বিখ্যাত হতে পেরেছেন তারা সৃজনশীল কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন বলে।

সংশ্লেষী এবং সৃজনশীল, উভয় কল্পনা শক্তিই ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর সতর্ক হয়ে ওঠে, যেভাবে ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের পেশী পুষ্ট করে তোলা হয়, সেরকম।

আকাঙ্ক্ষা একটি চিন্তা, একটি আবেগমাত্র। এটি ঝাপসা এবং স্বল্পস্থায়ী। এটি বিমূর্ত, এটি মূল্যহীন যদি না এটিকে শরীরী রূপ দেয়া হয়।

আপনি যদি নির্জীব থাকেন তাহলে আপনার কল্পনাশক্তিও দুর্বল হয়ে যেতে পারে। এ শক্তির মৃত্যু ঘটে না তবে ব্যবহারের অভাবে নিশ্চল হয়ে পড়ে। আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন কিছুক্ষণের জন্য হলেও যাতে আপনার সংশ্লেষী কল্পনার উন্নতি ঘটে। কারণ আকাঙ্ক্ষা টাকায় রূপান্তর ঘটাতে হলে এ শক্তির ব্যবহার প্রায়ই প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

অস্পর্শনীয় আবেগের রূপান্তর বা আকাঙ্ক্ষাকে পরিণত করতে হবে স্পর্শনীয় বাস্তবে যার নাম টাকা, এ জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা। আর এ পরিকল্পনা তৈরি হবে কল্পনার সাহায্যে বিশেষ করে সংশ্লেষী শক্তির সাহায্যে।

এ বইটি আগাগোড়া পড়ার পরে এ অধ্যায়ে ফিরে আসুন এবং একটি বা একাধিক পরিকল্পনা তৈরিতে আপনার কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগান। কীভাবে পরিকল্পনা করবেন তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রায় প্রতিটি অধ্যায়েই দেয়া আছে। আপনার কাজে লাগে এরকম নির্দেশাবলী বেছে নিন, পরিকল্পনাগুলো নোট করুন খাতায়, যদি আপনি ইতোমধ্যে তা করে না থাকেন। আপনি যে মুহূর্তে এ কাজটি শেষ করবেন সেই মুহূর্তটি অস্পর্শনীয় আকাঙ্ক্ষার নিরেট একটা কাঠামো পেয়ে যাবেন।

কীভাবে কল্পনার বাস্তব ব্যবহার করবেন

সকল ধন সম্পদের শুরুর পয়েন্টই হলো আইডিয়া। আর আইডিয়ার সৃষ্টি হয় কল্পনা থেকে। একটি গল্প বলি শুনুন।

পঞ্চাশ বছর আগে এক বৃদ্ধ গ্রাম্য চিকিৎসক ঘোড়ায় চড়ে শহরে এসেছিলেন। তিনি ঘোড়াটিকে বেঁধে রেখে একটি ওষুধের দোকানের খিড়কির দুয়ার দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তরুণ দোকানির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বহুজনের মধ্যে সম্পদ বিতরণ।

ঘণ্টাখানেক দু'জনে নিচু গলায় গল্প করলেন। তারপর চলে গেলেন বৃদ্ধ ডাক্তার। ফিরে এলেন একটি ভারী এবং সেকেলে কেটলি এবং কাঠের একটি বড়হাতল (কেটলির ভেতরকার জিনিস নাড়াচাড়া করার জন্য) নিয়ে। এগুলো দোকানের পেছনে রাখলেন।

দোকানি কেটলিটি পরখ করে দেখে পকেটে যা ছিল সব ডাক্তারকে দিয়ে দিল। মোট ৫০০ ডলার। ডাক্তার বিনিময়ে তাকে একটি ছোট কাগজ দিলেন যাতে একটি গোপন ফর্মুলা লেখা ছিল। ওই ছোট কাগজটিতে যা লেখা ছিল তা একজন রাজার ধন ভাণ্ডারের ধনরত্নের সমান মূল্যের। ওই জাদুর শব্দগুলো দিয়ে কেটলির পানি ফোটানো যেত। তবে ডাক্তার কিংবা দোকানি কেউই জানত না কেটলি থেকে কী দামি দামি সম্পদ বেরুবে!

পাঁচশো ডলারে জিনিসটি বিক্রি করে খুব খুশি ডাক্তার। এ দিয়ে তাঁর দেনা শোধ করা যাবে এবং তিনি পাবেন মনের স্বাধীনতা। দোকানি এক টুকরো কাগজ এবং পুরানো একটি কেটলির বদলে সারা জীবনের সঞ্চয় ব্যয় করে বিরাট একটি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিল। সে কোনোদিন স্বপ্নেও দেখেনি তার বিনিয়োগ আলাদিনের চেরাগের মতো জাদুকরী কাজ দেখাবে এই কেটলি থেকে। সে রাশি রাশি সোনা পাবে। আসলে দোকানি যা কিনেছিল তা হলো **আইডিয়া**। ওর পুরানো কেটলি, কাঠের হাতল, কাগজে গোপন মেসেজ ইত্যাদি সবই ছিল এর আনুষঙ্গিক বিষয়। কেটলির নতুন মালিক এতে একটা উপাদানের কিছু গোপন জিনিস মেশালে

কেটলিটি রীতিমতো ম্যাজিক দেখাতে শুরু করে। আর এর কথা বুড়োটি কিছুটি জানতেন না।

এ গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং আপনার কল্পনা শক্তির একটা পরীক্ষা নিন। দেখুন আপনি বুঝতে পারেন কিনা যে তরুণটি গোপন মেসেজে কী যোগ করেছিল যাতে কেটলি থেকে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। তবে মনে রাখবেন আপনি যেটি পড়ছেন তা আরব্য রজনীর কোনো গল্প নয়। আপনি এখানে একটি ফ্যাক্টের ঘটনা পড়লেন যা ফিকশনের চেয়ে বৈচিত্র্যময়, এ ফ্যাক্টের শুরু আইডিয়া হিসেবে।

এখন একবার দেখা যাক এ আইডিয়া কী পরিমাণ স্বর্ণ সম্পদ উৎপাদন করেছিল। এটি আগেও করেছে, এখনও গোটা পৃথিবী জুড়ে নারী-পুরুষকে সম্পদ বিলোচ্ছে। তারা কেটলির উপাদানগুলো লাখ লাখ মানুষের মাঝে বিতরণ করছে।

পুরানো কেটিলিটি এখন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ চিনি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে যা হাজার হাজার মানুষকে ইক্ষু উৎপাদনের কাজ যুগিয়েছে, তারা আখের রস দিয়ে চিনি বানিয়ে বাজারজাত করছে।

এই পুরানো কেটলি বছরে লাখ লাখ কাচের বোতল তৈরি করছে বিপুল পরিমাণ কাচ শ্রমিকদের জন্য চাকরি জোটাচ্ছে। পুরানো কেটলি গোটা দেশ জুড়ে শত শত ক্লার্ক, স্টোনোগ্রাফার, কপি রাইটার এবং অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপার্টদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।

পুরানো কেটলিটি একটি ছোট দক্ষিণী শহরকে দক্ষিণের বাণিজ্য রাজধানী বানিয়েছে যেটি এখন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শহরের প্রতিটি অধিবাসীর উপকার করছে।

এ আইডিয়া বিশ্বের প্রতিটি সভ্য দেশের উপকার করছে, যারা একে স্পর্শ করছে তারাই সোনার মালিক হতে পারছে।

কেটলির সোনা দক্ষিণের বিখ্যাত একটি কলেজ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে যেখানে সহস্রাধিক তরুণ সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনিং পাচ্ছে।

পুরানো কেটলিটি আরো কিছু দারুণ জিনিস করেছে। বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার সময় যখন কারখানা, ব্যাংক এবং বিজনেস হাউসগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল এবং হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়ে পড়ছিল ওই সময় এই জাদুর কেটলি বিশ্বজুড়ে বহু নারী-পুরুষের চাকরির সংস্থান করেছে যাদের অনেক আগে থেকেই

এ আইডিয়াটির প্রতি বিশ্বাস ছিল। পিতলের পুরানো কেটলিটি যদি কথা বলতে পারত তাহলে এটি প্রতিটি ভাষায় রোমান্সের রোমাঞ্চকর গল্প বলত। এ হলো প্রেমের রোমান্স, বিজনেসের রোমান্স, পেশাদার নারী-পুরুষের রোমান্স যারা প্রতিদিন এর দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়।

এ বইয়ের লেখকও এরকম একটি রোমান্সের অংশীদার। যেখানে বসে ওষুধের দোকানদার কেটলিটি কিনেছিল সেখান থেকে বেশি দূরে ছিলেন না লেখক। এখানেই লেখক তার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর স্ত্রীই প্রথম লেখককে জাদুর কেটলির গল্প বলেন।

কেটলির একটি পানীয় পান করতে করতে লেখক তার স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

এখন আপনারা জানেন জাদুর কেটলির ভেতরে ছিল একটি পানীয়। এ পানীয় পান করে লেখক উজ্জীবিত হতেন। আর সেই পানীয়টির নাম কোকা-কোলা। একটি সিঙ্গল আইডিয়া থেকে এ কোকা-কোলার জন্ম যা তার মালিককে বিপুল সম্পদের অধিকারী করেছে। আর সেই গোপন ফর্মুলাটি ছিল... **কল্পনা!**

কোকো-কোলা বিশ্বের এক নম্বর পছন্দের একটা ড্রিংক। এ পানীয় পৃথিবীজুড়ে মানুষের কর্মসংস্থান করেছে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন এর মালিক। আর সবকিছুই সম্ভব হয়েছে স্রেফ কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে!

নয়

সংগঠিত পরিকল্পনা

আকাঙ্ক্ষাকে স্ফটিকস্বচ্ছ করে তোলা

ধনী হওয়ার ষষ্ঠ পদক্ষেপ

আপনি জেনেছেন যে মানুষ যা তৈরি করে কিংবা অর্জন করে তার শুরুটা হয় আকাঙ্ক্ষার আকারে, আকাঙ্ক্ষা যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিমূর্ত থেকে মূর্ততায়, যা তৈরি হয় কল্পনার কর্মশালায় এবং যেখানে প্ল্যান বা পরিকল্পনাসমূহ সৃষ্টি হয় ও সংগঠিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আপনাকে ছয়টি সুনির্দিষ্ট, বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যেখানে প্রথম পদক্ষেপটিকে অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষাকে রূপান্তরিত করে অর্থের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। এখন আপনাকে কিছু পরামর্শ দেয়া হবে যা প্রাকটিকাল প্ল্যান গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে:

ক) কিছু সৃষ্টি বা নির্মাণের জন্য যত লোক দরকার তাদেরকে দিয়ে একটি গ্রুপ বা দল তৈরি করুন। 'মাস্টার মাইন্ড' এর প্রিন্সিপাল অনুসরণ করে আপনার পরিকল্পনা করে ফেলুন যা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।

খ) 'মাস্টার মাইন্ড' গ্রুপ তৈরির আগে ভেবে নিন আপনার দলের লোকদেরকে কী কী সুবিধা দিতে পারবেন তাদের সহযোগিতার বদলে। কিছু না পেলে কেউই আসলে কাজ করতে চায় না। যথেষ্ট পরিমাণ কমপেনসেশন না পেলে কোনো বুদ্ধিমান মানষুই আপনার সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহবোধ করবে না। তবে সে কমপেনসেশন বা ক্ষতিপূরণ যে আর্থিক মূল্যেরই হতে হবে তা কিন্তু নয়।

গ) সপ্তাহে অন্তত: দুই দিন আপনার 'মাস্টার মাইন্ড' এর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন, সম্ভব হলে আরো বেশি। আর এ সাক্ষাত ততদিন চলবে যতদিন পর্যন্ত না প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাটির একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে না যায়।

ঘ) আপনার এবং আপনার 'মাস্টার মাইন্ড' গ্রুপের প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে **যথার্থ ঐকতান** গড়ে তুলুন। এটি যদি গড়ে তুলতে না পারেন তাহলে আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হবেন। PERFECT HERMONY ব্যতীত 'মাস্টার মাইন্ড' গড়ে তোলার উদ্দেশ্য কোনোভাবেই সফল হবে না।

পৃথিবীর কোনো মানুষই যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষিত নয় এবং বিপুল অর্থসম্পদ গড়ে তোলার মতো জ্ঞানও তাদের নেই। অন্যদের সহযোগিতা তাদের অবশ্যই প্রয়োজন। আপনি যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করুন না কেন, তার বাস্তবায়ন ঘটাতে হলে 'মাস্টার মাইন্ড' গ্রুপের সাহায্য লাগবেই। আপনি নিজেই পরিকল্পনা করতে পারেন, পুরোটা অথবা অংশবিশেষ, তবে **নিশ্চিত হয়ে নেবেন ওই পরিকল্পনা যেন আপনার 'মাস্টার মাইন্ড' গ্রুপের সদস্যরা পরীক্ষা করে দেখে এবং এতে অনুমোদন প্রদান করে।**

প্রথম যে পরিকল্পনাটি আপনি গ্রহণ করেছেন তা সফল না হলে আরেকটি প্ল্যান করুন। নতুন এই পরিকল্পনাটিও মুখ থুবড়ে পড়লে আরেকটি পরিকল্পনা করবেন। সঠিক পরিকল্পনাটি কাজে না লাগা পর্যন্ত প্ল্যান করেই যান। বেশিরভাগ মানুষ কেন ব্যর্থ হয় জানেন—তাদের লেগে থাকার ধৈর্যই নেই। একটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেই তারা হাল ছেড়ে দেয়, নতুন কোনো পরিকল্পনার দিকে আর হাত বাড়ায় না।

সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষটির পক্ষেও অর্থ উপার্জনের জন্য পরিকল্পনা করে এগোতে হয়, নইলে কিছুই সে পাবে না। শুধু মনে রাখবেন আপনার পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হবে, ওই ব্যর্থতা সাময়িক মাত্র, চিরস্থায়ী নয়। এর মানে হলো আপনার প্রথম পরিকল্পনাটি হয়তো সঠিক ছিল না। আরেকটি প্ল্যান করুন। আবার প্রথম থেকে শুরু করুন।

বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের আগে টমাস আলভা এডিসনকে দশ হাজার বার ব্যর্থ হতে হয়েছিল। অবশেষে তিনি সফল হন।

সাময়িক ব্যর্থতার একটাই অর্থ ইংগিত করে আপনার পরিকল্পনার কোথাও গলদ ছিল। লাখ লাখ মানুষ দুঃখ-দুর্দশার মাঝে দিন কাটায় তার কারণ, অর্থ উপার্জনের জন্য তাদের কোনো সঠিক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই।

হেনরি ফোর্ড বড় লোক হতে পেরেছিলেন সঠিক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের কারণে। ফোর্ডের চেয়ে হাজার বেশি শিক্ষিত মানুষ দরিদ্রভাবে বসবাস করে কারণ তারা অর্থ আয়ের জন্য সঠিক পরিকল্পনাটি বেছে নিতে জানে না।

হেনরি ফোর্ডও কিন্তু সাময়িক ব্যর্থতার স্বাদ নিতে হয়েছিল, সেটা অটোমোবাইল ব্যবসা শুরুর প্রথম দিকে নয়, যখন তিনি ক্যারিয়ারের শীর্ষে ওই সময়। তিনি নতুন নতুন পরিকল্পনা করেছেন এবং অর্থনৈতিক বিজয়ের পথে এগিয়ে গেছেন।

আমরা বড় বড় মানুষদের সাফল্যই শুধু দেখি কিন্তু তাঁরা যে সাময়িক কত ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছিলেন সে বিষয়গুলো এড়িয়ে যাই।

যখন ব্যর্থ হবেন, বুঝে নেবেন আপনার পরিকল্পনা সুষ্ঠু না হওয়ার এটি একটি সংকেত, নতুন করে পরিকল্পনা করুন এবং ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে আবার শুরু করুন যাত্রা। লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগেই হাল ছেড়ে দিলে আপনি হবেন একজন 'কুইটার' অর্থাৎ যে দায়িত্ব পালন না করে বা কাজ শেষ না করেই চলে যায়।

একজন কুইটার কখনো জিততে পারে না এবং একজন বিজয়ী কখনো হাল ছাড়ে না।

এ কাজটি একটি কাগজে বড় বড় করে লিখে খাটের সামনে কোথাও সেঁটে রাখুন যাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় প্রতিরাতে কথাটি আপনার চোখে পড়ে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠেও লেখাটি দেখতে পান।

আপনি যখন 'মাস্টার মাইন্ড' দল তৈরি করবেন তখন এমন সব লোকজন বাছাই করবেন যারা পরাজয়ে ভীত নয়। পরাজয়কে যারা পাত্তাই দেয় না। কিছু বোকা লোক বিশ্বাস করে টাকা দিয়েই কেবল টাকা বানানো যায়। এ কথা সত্য নয়! একমাত্র আকাঙ্ক্ষা দিয়েই অর্থ উপার্জন সম্ভব। টাকা কথা বলতে পারে না, নড়াচড়া করতে জানে না, তবে কোনো মানুষ যখন তাকে কাছে ডাকে তখন সে সেই আহ্বান 'শুনতে' পায়।

পৃথিবীতে দুই ধরনের লোক আছে। এক ধরনের মানুষ নেতা, অপর ধরনটি অনুসারী। আপনি নেতা হবেন নাকি অনুসারী আগে সেটা ঠিক করুন। অনুসারী হওয়ার মধ্যে কোনো অসম্মান নেই বটে তবে একজন অনুসারী হয়ে থাকাও কোনো কাজের কথা নয়। বেশিরভাগ নেতাই শুরুতে অনুসারী ছিলেন তবে তাঁরা ছিলেন **বুদ্ধিমান অনুসারী**। অল্প কিছু উদাহরণ বাদে, যে মানুষ একজন নেতাকে বুদ্ধি দিয়ে অনুসরণ করতে পারে না সে দক্ষ নেতাও হতে পারে না। আর যে লোক তার নেতাকে দক্ষতার সঙ্গে অনুসরণ করে, সে খুব দ্রুত নিজেই নেতা হয়ে ওঠে। একজন বুদ্ধিমান অনুসারীর নানান সুবিধা থাকে, এর মধ্যে একটি হলো **সে তার নেতার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের সুযোগ লাভ করে।**

নেতৃত্বের প্রধান গুণ

একজন নেতার নিম্নলিখিত গুণগুলো থাকা দরকার:

১. **প্রচণ্ড সাহস:** একজন নেতাকে প্রচণ্ড সাহসী হতে হবে। যে নেতার সাহস এবং আত্মবিশ্বাস নেই কেউ তার অনুসারী হতে চায় না। কোনো বুদ্ধিমান অনুসারী এরকম নেতার অধীনে খুব বেশিদিন কাজ করে না।

২. **আত্মনিয়ন্ত্রণ** যে লোক নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে না সে অন্যদেরকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

৩. **বিচার বুদ্ধি** একজন নেতার নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধি থাকতে হবে নইলে কেউ তাকে মানতে চাইবে না।

৪. **সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা** যে লোক দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম তাকে সবাই দুর্বল মানুষ বলেই ভাবে। এ ধরনের লোক অন্যদেরকে সফলভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে না।

৫. **দ্ব্যর্থহীন পরিকল্পনা** একজন সফল নেতা অবশ্যই পরিকল্পনা করে কাজ করবেন। যিনি অনুমান নির্ভর, যার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই তাকে রাডারবিহীন জাহাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আজ হোক কাল হোক এরকম নেতা পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খাবেনই।

৬. **অতিরিক্ত কাজ করার অভ্যাস:** একজন ভালো নেতার অবশ্যই অতিরিক্ত কাজ করার অভ্যাস থাকতে হবে, সেই সদিচ্ছা বজায় রাখতে হবে মনে।

৭. **সদাশয় ব্যক্তিত্ব** অগোছালো, অসাবধানী এবং নির্লিপ্ত স্বভাবের মানুষ কখনো সফল নেতা হতে পারে না। নেতৃত্বকে সবাই সম্মানের চোখে দেখে। যে নেতা সদাশয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন তাঁকে তাঁর অনুসারীরা কখনো সম্মান করবে না।

৮. **সহানুভূতিশীল এবং বুঝদার** একজন সফল নেতাকে অবশ্যই তাঁর অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বুঝদার থাকতে হবে। তাদের সমস্যাগুলোও তাঁকে বুঝতে হবে।

৯. **সর্বজ্ঞান সম্পন্ন** সর্বজ্ঞানসম্পন্ন একজন নেতাই সফল নেতা হবার যোগ্যতা রাখেন।

১০. **দায় স্বীকারের সদিচ্ছা** একজন সফল নেতা তাঁর অনুসারীদের সমস্ত ভুলের দায় স্বীকার করতে কখনো পিছ পা হন না। তিনি যদি পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান তাহলে আর নেতা থাকতে পারবেন না। তাঁর দলের কোনো অনুসারী যদি কোনো ভুল করে ফেলে অথবা নিজেকে অযোগ্য বলে প্রমাণ করে তাহলে তার দায় স্বীকার করতে হবে ওই কর্মীর নেতাকেই।

১১. **সহযোগিতা :** একজন সফল নেতা বুঝদার হবেন এবং তাঁর আচরণ হবে সহযোগিতামূলক, তাঁর অনুসারীদের মাঝেও এই সহযোগী মনোভাবটি তিনি প্রবেশ করাবেন। ক্ষমতার জন্য নেতৃত্ব আর ক্ষমতা পেতে হলে সহযোগিতা করা অবশ্যম্ভাবী।

নেতৃত্ব হয় দুই ধরনের। প্রথম ধরনটি সর্বজন স্বীকৃত আর তা হলো, **সর্বসম্মতির দ্বারা নেতা,** যেখানে অনুসারীদের সহানুভূতি থাকে। অপরটি হলো **গায়ের জোরে নেতা**। এ শ্রেণীর নেতাদের প্রতি অনুসারীদের কোনো সহানুভূতি বা সম্মতি থাকে না।

ইতিহাস সাক্ষী দেয় গায়ের জোরে বনে যাওয়া নেতারা বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেন না। যুগে যুগে স্বৈরাচারী শাসক এবং রাজা-রাজরাদের পতন হয়েছে। এর কারণ অনুসারীরা এ নেতাদের মেনে নেয়নি।

নেপোলিয়ন, জার্মানির কাইজার উইলহেলম, রাশিয়ার জার, স্পেনের রাজা এরা সকলেই গায়ের জোরে বনে যাওয়া নেতাদের উদাহরণ। এরা খুব বেশিদিন কিন্তু নেতৃত্ব ধরে রাখতে পারেননি। নেতারা কেন ব্যর্থ হন? এর কারণগুলো হলো:

নেতৃত্বে ব্যর্থতার ১০টি কারণ

১. সংগঠিত করার ব্যর্থতা: দক্ষ নেতৃত্বের জন্য সংগঠিত করার গুণ থাকতে হবে, নইলে নেতা ব্যর্থ হবেন। কোনো মানুষ, সে নেতা হোক বা অনুসারী, যদি বলে যে সে তার পরিকল্পনা পরিবর্তন কিংবা কোনো ইমার্জেন্সিতে তেমন মনোযোগ দিতে পারেনি অন্য কাজে খুব বেশি ব্যস্ততার কারণে, তাহলে কিন্তু সে পক্ষান্তরে নিজের অদক্ষতাকেই তুলে ধরল।

একজন সফল নেতাকে অবশ্যই তিনি যে অবস্থাতে আছেন তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ-খবর রাখতে হবে। এর মানে অনুসারীদের সঙ্গে তাঁর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকবে।

২. কাজ করতে অনীহা প্রকৃত নেতারা কদাপি কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করেন না। ব্যর্থ নেতারাই কাজ করতে চায় না।

৩. তারা যা জানে সে জন্য কাজ না করে বরং তারা যা 'জানে' সেজন্য প্রাপ্তির আশা করে। লোকে তাদেরকেই কিছু দেয় যে নেতারা তাদের জন্য কাজ করে। কাজ না করে বসে থাকা নেতাদের লোকে প্রত্যাখ্যান করে।

৪. অনুসারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভয় যে নেতা সবসময় ভয়ে থাকে এই বুঝি তার কোনো অনুসারী তার জায়গা দখল করে বসল, সে ব্যর্থ নেতা।

৫. কল্পনা শক্তির অভাব কল্পনা শক্তির অভাব থাকলে একজন নেতা জরুরি অবস্থার সময় কিছুই করতে পারে না, সে তার অনুসারীদের জন্য পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যর্থ হয়।

৬. স্বার্থপরতা যে নেতা তার কর্মীদের কাজের ক্রেডিট নিজে নেয় তাকে কেউ পছন্দ করে না। প্রকৃত নেতারা কখনো কোনো কাজের জন্য নিজে ক্রেডিট নেন না। তিনি বরং তাঁর অনুসারীদেরকে এ সম্মান দিতে পছন্দ করেন।

৭. অমিতাচারী একজন অমিতাচারী নেতাকে তার অনুসারীরা সম্মান করে না। বরং কেউ অসংযমী এবং অমিতাচারী হলে নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে।

৮. অবিশ্বস্ততা এটি আসলে তালিকার শীর্ষে থাকা উচিত। যে নেতা তার কর্মীদের প্রতি অবিশ্বস্ত সে বেশিদিন নেতা হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না। জীবনের পথে চলতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণও কিন্তু এই অবিশ্বস্ততা।

৯. নেতৃত্বের কর্তৃত্বের ওপর জোর প্রদান: একজন দক্ষ নেতা তার অনুসারীদেরকে পরিচালনা করবেন উৎসাহ নিয়ে, তাদের ভেতরে ভীতির সঞ্চার করে নয়। যে নেতা তার অনুসারীদের ওপর সবসময় কর্তৃত্ব ফলায় সে গায়ের জোরের নেতার ক্যাটাগরিতে পড়ে যায়। একজন প্রকৃত নেতা সহানুভূতি, সদাচরণ, অপরকে বুঝবার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণ দিয়েই অনুসারীদের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যেতে পারেন, সেজন্য তাঁর কখনো গায়ের জোর ফলানোর প্রয়োজন হয় না।

১০. পদবীর ওপর গুরুত্ব প্রদান একজন যোগ্য নেতার তাঁর অনুসারীদের

সম্মান লাভ করার জন্য কোনো পদবীর প্রয়োজন হয় না। যে লোক নিজের পদবীটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয় সে অপরের হাসির পাত্রে পরিণত হয়। প্রকৃত নেতার দরজা সবসময় সবার জন্য খোলা থাকে এবং তিনি কোনো ফরমালিটিরও ধার ধারেন না।

দশ

চাকরি

চাকরির আবেদনপত্রে যেসব তথ্য থাকা প্রয়োজন

চাকরির আবেদনপত্র বা ব্রিফিংয়ের কাজটি খুব সাবধানে করা দরকার। কেউ এ ধরনের ব্রিফিং লিখতে না পারলে সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন। ব্রিফিংয়ে যেসব তথ্য উল্লেখ থাকা দরকার তা হলো

১. শিক্ষা: সংক্ষেপে তবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন আপনি কোথায় পড়ালেখা করেছেন এবং কোন বিষয়ে আপনি অনার্স বা এম.এ. করেছেন এবং কেন ওই বিষয় বেছে নিয়েছেন তা-ও সংক্ষেপে লিখুন।

২. রেফারেন্স: প্রতিটি বিজনেস ফার্মই পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড ইত্যাদি জানতে চায়। আপনি আপনার ব্রিফিংয়ে যেসব ফটোকপি লেটার যোগ করবেন তা হলো:

ক. পূর্ববর্তী চাকরিদাতার রেফারেন্স লেটার।

খ. আপনি যেসব শিক্ষকের অধীনে কাজ করেছেন তাদের কাছ থেকে চিঠি।

গ. বিখ্যাত কোনো ব্যক্তি যাদের রেফারেন্সকে মূল্য দেয়া হয়।

৩. নিজের সদ্য তোলা ছবি আবেদনপত্রের সঙ্গে যোগ করবেন।

৪. নির্দিষ্ট কোনো পজিশনের জন্য আবেদন করুন। কখনোই আবেদনপত্রে লিখবেন না যে 'যে কোনো একটি পজিশন' হলেই চলবে। এর অর্থ আপনার বিশেষ কোয়ালিফিকেশনের অভাব রয়েছে।

৫. যে নির্দিষ্ট পজিশনের জন্য আবেদন করছেন তার জন্য আপনার কী কী কোয়ালিফিকেশন বা যোগ্যতা রয়েছে সে কথা উল্লেখ করুন। আপনি কেন অমুক পজিশনটির জন্য নিজেকে যোগ্য মনে করছেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিন।

৬. আবেদনপত্রে বলুন আপনি অমুক পজিশনটির জন্য প্রবেশনে কাজ করতে রাজি। আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত পজিশনের জন্য দুই এক সপ্তাহ বা মাসখানেক বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করলেই আপনার নিয়োগদাতা বুঝতে পারবেন আপনি

আসলে কেমন কাজ জানেন। প্রবেশন পিরিয়ডে কাজ করার ফলে যা ঘটবে তা হলো

ক. পজিশনটির জন্য আপনার ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস কতটা রয়েছে তা বোঝা যাবে।

খ. ট্রায়াল শেষে আপনার আত্মবিশ্বাস আপনার বিষয়ে চাকরিদাতাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

গ. এ প্রবেশন প্রমাণ করবে ওই পজিশনটি পেতে আপনি কতটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

৭. আপনি যে প্রতিষ্ঠানের জন্য আবেদন করবেন সেই প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে খোঁজখবর নিন। আবেদন করার আগে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে যথেষ্ট রিসার্চ করুন এবং আবেদনপত্রে ইঙ্গিত দিন আপনি তাদের সম্পর্কে কী কী জানেন।

এতে কী হবে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা খুশি হবেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন আপনার ভেতরে কল্পনাশক্তি রয়েছে এবং এই পজিশনটিতে কাজ করতে আপনি সত্যি ইচ্ছুক।

আপনার ব্রিফিং যদি দীর্ঘ হয়ে যায়, চিন্তার কিছু নেই। আপনি যেমন নিরাপদ চাকরি খুঁজছেন, চাকরিদাতাও তেমনি যোগ্য আবেদনকারীর সন্ধান করছেন। সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররাই সফল হন যারা সঠিক কাজের লোকটিকে খুঁজে বের করতে পারেন।

আরেকটি কথা মনে রাখবেন, আবেদনপত্র যেন ঝকঝকে, তকতকে হয়, কোনো কাটাকুটি না থাকে। অনেক সময় নির্ভুল, সুন্দর আবেদনপত্র দেখেই প্রার্থীর চাকরি হয়ে যায়, তার ব্যক্তিগত ইন্টারভ্যুর প্রয়োজন হয় না।

আবেদনপত্র লেখা হলে তা খামে পুরে, খামের ওপরে কোনো আর্টিস্টকে দিয়ে সুন্দরভাবে লিখিয়ে নিন:

BRIEF OF THE QUALIFICATIONS OF ROBERT R. SMITH APPLYING FOR THE POSITION OF PRIVATE SECRETARY TO THE PRESIDENT OF THE BANK COMPANY. Inc.

খামের ওপর এই যে পার্সোনাল টাচটি থাকবে তা কিন্তু চাকরিদাতার মনোযোগ আকর্ষণ করবে। দামী ভালো কাগজে আবেদনপত্র লিখবেন, আবেদনপত্রের কোনো এক পৃষ্ঠায় আপনার ছবি থাকবে।

সফল সেলসম্যানরা সযতনে নিজেদেরকে গড়ে তোলে তারা জানে প্রথমে দর্শনাধারী পরে গুণবিচারী। আপনার আবেদনপত্র সেলসম্যানের কাজ করবে।

আপনার আকাঙ্ক্ষিত পজিশনটি কীভাবে পাবেন

যে যে কাজের জন্য দক্ষ সে সেই কাজটি পেলে আনন্দের সঙ্গেই করে। একজন চিত্রকর পেইন্ট নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন, একজন কারিগর হাত দিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন, একজন লেখক লেখালেখিতে আনন্দিত হন। তো আপনি যে কাজটি করতে চান সেটি কীভাবে পেতে পারেন তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১. সবার আগে সিদ্ধান্ত নিন আপনি আসলে ঠিক কী ধরনের কাজ করতে চাইছেন। সেরকম কাজ না থাকলে আপনি হয়তো সেটা সৃষ্টি করে নিতে পারবেন।

২. আপনি যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করতে চান তা নির্বাচন করুন।

৩. আপনি আপনার চাকরিদাতা সম্পর্কে সবরকম খোঁজখবর নিন। যেমন তার পলিসি, পারসোনেল এবং এখানে এগিয়ে যাওয়ার কতটুকু সুযোগ রয়েছে ইত্যাদি।

৪. নিজেকে বিশ্লেষণ করুন। আপনার ট্যালেন্ট, সামর্থ, ভেবে নিন *আপনি আসলে কী দিতে পারবেন*। এসবের মধ্যে রয়েছে সুযোগ সুবিধা, সেবা, ডেভলেপমেন্ট, আইডিয়া ইত্যাদি।

৫. চাকরির কথা ভুলে যান। আমার জন্য কোনো কাজ আছে? এ কথাটি বিস্তৃত হয়ে বরং মনোযোগ দিন আপনি কী করতে পারবেন।

৬. আপনার মাথায় যখন একটি প্ল্যান চলে আসবে, সেটি কোনো অভিজ্ঞ লেখককে দিয়ে কাগজে লিখিয়ে নিন এবং বিস্তারিতভাবে।

৭. এ কাগজটি যথাযথ ব্যক্তির সমীপে পেশ করুন। বাকিটা তিনিই করবেন। প্রতিটি কোম্পানিই সেইরকম লোক খোঁজে যে মূল্যবান কিছু দিতে পারে, হোক সেটা আইডিয়া বা অন্য কিছু। কোম্পানির উপকারে আসবে এরকম কোনো পরিকল্পনা যদি কেউ কাজে লাগাতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিটি কোম্পানিতেই ঘর খালি থাকে।

এভাবে কাজ করতে গেলে হয়তো কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে তবে এর ফলে স্বল্প বেতনে দীর্ঘ পরিশ্রমের কবল থেকে রক্ষা হবে।

আপনার QQS রেটিং কেমন?

QQS মানে Quality, Quantity এবং Spirit. সেবায় কোয়ালিটি আপনাকে কবজায় রাখতেই হবে। আর কোয়ানটিটি বা কাজের পরিমাণ বৃদ্ধিরও কোনো বিকল্প নেই। আর স্পিরিট হলো কোম্পানির সকলে মিলে কাজ করার স্পৃহা এবং গতি।

মার্কেটে আপনি যে সার্ভিস দিচ্ছেন তাতে কেবল কোয়ালিটি এবং কোয়ানটিটি মেইনটেইন করলেই চলবে না, স্পিরিটেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এন্ড্রু কার্নেগি তাঁর ব্যবসায় তিনটি জিনিস নিয়মিত অনুসরণ করতেন। তিনি বলতেন তিনি তাঁর কোম্পানিতে সেরকম লোক রাখেন না যে কিনা সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারে না। অর্থাৎ এখানেও সেই স্পিরিটের প্রশ্ন। ওই লোক যতই কোয়ালিটিসম্পন্ন হোক বা প্রচুর কাজ করুক, সেই কোম্পানির ঐকতান বজায় রাখতে না পারলে তিনি তাকে দিয়ে আর কাজ করাতেন না।

একটি কোম্পানিতে দশে মিলে, স্বত:স্ফূর্তভাবে কাজ করতে হয় আর এটাই হলো যথার্থ স্পিরিট বা গতি। একজন লোক তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে যদি সকলকে মুগ্ধ করতে পারে, তার কারণে কোম্পানিতে একটা ছন্দ বা সুর তৈরি হয়, সেই মানুষটির কোয়ালিটি যদি বেশি না-ও থাকে এবং তার কাজের কোয়ানটিটি আশানুরূপ না হলেও ওই স্পিরিটের দৌলতেই তার এ খামতি দুটো কিন্তু পূরণ হয়ে যায়। একটা কথা মনে রাখবেন **সুমধুর আচরণ ছাড়া কোনো কিছু সফল হয় না।**

ব্যর্থতার ৩০টি কারণ

এ কারণগুলোর কয়টি আপনাকে পিছিয়ে রাখছে

জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হলো পুরুষ এবং নারী প্রাণপণে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। আর সফল মানুষদের চেয়ে ব্যর্থদের সংখ্যাই বেশি। আমি হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি যাদের মধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগ নারী-পুরুষ বলেছে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এ সভ্যতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কিছু গলদ রয়েছে যার জন্য ৯৮ শতাংশ মানুষকে ব্যর্থতার স্বাদ পেতে হয়। তবে আমি এ বইতে পৃথিবীর ভুল এবং ঠিক নিয়ে কথা বলতে বসিনি, সেরকম কিছু লিখতে গেলে সে বইটি আকারে এটির চেয়ে অন্তত একশো গুণ বেশি বড় হবে।

আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি মানুষের ব্যর্থতার পেছনে অন্তত ৩০টি কারণ রয়েছে আর সম্পদ গড়ে তোলার জন্য রয়েছে ১৩টি পদক্ষেপ। এ অধ্যায়ে ব্যর্থতার জন্য প্রধানত দায়ী সেই ৩০টি কারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। দেখুন আপনার সফলতা এবং ব্যর্থতার মাঝে এসব কারণের কতগুলো দায়ী।

১. **প্রতিকূল বংশানুক্রমিক ব্যাকগ্রাউন্ড :** কিছু মানুষ আছে যারা স্বল্প বুদ্ধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এজন্য অনেক সময় প্রতিকূল বংশানুক্রমিক ব্যাকগ্রাউন্ড কাজ করে থাকে। এটি ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। এ ব্যর্থতার কারণ সহজে শোধরাবার নয়।

২. **জীবনে সুসংজ্ঞায়িত উদ্দেশ্যের অভাব :** যে মানুষের জীবনে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই তার জীবনে সাফল্যের আশা করা বাতুলতা মাত্র। আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি একশো জন মানুষের মধ্যে আটানব্বই জনেরই জীবনে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না।

৩. **মাঝারি মানের ওপরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য করার অভাব** যে মানুষ মাঝারি মানের ওপরে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে পারে না তার

কাছ থেকে আমরা বিশেষ কিছু আশা করতে পারি না।

৪. **অপর্যাপ্ত শিক্ষা :** অপর্যাপ্ত শিক্ষা সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে বটে তবে এ অসুবিধাটি সহজেই জয় করা যায়। অভিজ্ঞতা বলে সেরা শিক্ষিত মানুষদের বেশিরভাগই স্বশিক্ষিত।

৫. **আত্ম-শৃঙ্খলার অভাব** শৃঙ্খলা আসে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। এর মানে হলো একজন মানুষকে সমস্ত নেতিবাচক দোষগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে জানতে হবে। আশপাশ নিয়ন্ত্রণ করার আগে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু খুবই কঠিন কাজ। নিজেকে জয় করতে না পারলে অন্যরা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই আপনি চিনতে পারবেন কে আপনার সবচেয়ে বড় বন্ধু আর কে প্রধানতম শত্রু।

৬. **দুর্বল স্বাস্থ্য :** সুস্বাস্থ্য ছাড়া কেউ সাফল্য উপভোগ করতে পারে না। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য নানা কারণ দায়ী। যেমন

ক. স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী নয় সেরকম খাদ্য অতিরিক্ত গ্রহণ।

খ. সব সময় নেতিবাচক চিন্তা।

গ. অতিরিক্ত সেক্স করা।

ঘ. সঠিক শারীরিক অনুশীলনের অভাব

ঙ. তাজা বাতাস গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকা।

৭. **শৈশবে প্রতিকূল পরিবেশের মাঝে বড় হওয়া :** যেসব মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেশি থাকে, দেখা যায় তাঁদের বেশিরভাগেরই শৈশব কেটেছে প্রতিকূল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মাঝে। আর তারা ছোটবেলায় ভালো বন্ধুও পায়নি।

৮. **দীর্ঘসূত্রতা বা কোনো কাজে গড়িমসি করা** এটি ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। কাজে গড়িমসি করতে গিয়ে অনেকেই সফল হওয়ার সুযোগ হারায়। আমরা অনেকেই ব্যর্থ হই কারণ আমরা কোনো কিছু শুরু করার জন্য কবে সঠিক সময়টি আসবে সেজন্য হাঁ করে বসে থাকি। অপেক্ষা করবেন না। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকেই শুরু করে দিন, হাতে যা আছে তা নিয়েই নেমে পড়ুন কাজে, কাজ করতে করতে বা এগোতে এগোতে দেখবেন আপনার যা যা প্রয়োজন তা এসে গেছে হাতে।

৯. **ধৈর্যের অভাব** আমরা অনেকেই শুরু করি মহা উৎসাহে, কিন্তু শেষটা আর করতে পারি না ধৈর্যের অভাবে। ধৈর্যের বিকল্প কিছু নেই।

১০. নেতিবাচক ব্যক্তিত্ব নেতিবাচক ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা কখনো সফল হতে পারে না। যারা মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করে না তারা ব্যর্থ মানুষ। সফলতা আসে শক্তির মাঝ দিয়ে। আর এ শক্তি মেলে অন্যদেরকে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে। নেতিবাচক ব্যক্তিত্বরা কখনো কারো জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় না।

১১. নিয়ন্ত্রিত যৌন আকাঙ্ক্ষার অভাব অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য সেক্স এনার্জি খুবই দরকার। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি আবেগ, একে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্য কাজে লাগাতে হবে।

১২. 'Something for nothing' এর অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা জুয়া খেলার নেশা লাখ লাখ মানুষকে ব্যর্থ করে। ১৯২৯ সালে ওয়াল স্ট্রিট বিপর্যয়ে লাখ লাখ মানুষ তাদের সর্বস্ব হারিয়েছিল কারণ স্টক কেনার জুয়াখেলায় তারা মেতে উঠেছিল।

১৩. সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অভাব সফল মানুষরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সেগুলো প্রয়োজনে পরিবর্তনও করেন তবে তা ধীরে সুস্থে। যারা ব্যর্থ মানুষ তারা সিদ্ধান্ত নেয় অতি মন্থর গতিতে এবং তা ঘন ঘন বদলায়। সিদ্ধান্তহীনতা এবং কাজে গড়িমসি করা যমজ দুই ভাইয়ের মতো। যেখানে একজনকে খুঁজে পেলে, অপরজনকেও পাওয়া যায়। এদেরকে নিকেশ করুন নইলে ব্যর্থ হবেন।

১৪. ভয় ভয় নিয়ে সামনের এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভয়কে জয় করতে না পারলে কাজে সাফল্য আসবে না।

১৫. ভুল বিবাহ : জীবনসঙ্গী বাছাইয়ে ভুল করলেও মানুষ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিয়ের বন্ধন দু'জন মানুষকে খুব কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু এ বন্ধনে যদি সুর ছন্দ না থাকে তাহলে ব্যর্থতা তো আসবেই। ভুল বিবাহ সংসারে ডেকে আনে দুঃখ-দুর্দশা এবং অসুখী পরিবেশ, এটি সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করে দিতে পারে।

১৬. অতিরিক্ত সতর্কতা : যে লোক জীবনে ঝুঁকি নিতে পারে না তাকে দিয়ে কিছুই হবে না। সব কিছুতেই অতিরিক্ত সতর্ক থাকা সুলক্ষণ নয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ঝুঁকি থাকবেই। একে মেনে নিয়েই এগোতে হবে।

১৭. ব্যবসায়ে ভুল সহযোগী বাছাই ব্যবসায়ে মার খাওয়ার জন্য এটি বিরাটভাবে দায়ী। এমন কোনো মানুষকে পার্টনার করা উচিত যে হতে পারে আপনার জন্য অনুপ্রেরণা, যে হবে বুদ্ধিমান এবং সফল একজন মানুষ। আপনার

সমকক্ষ হতে পারবে এমন কাউকেই ব্যবসায়ী সহযোগী হিসেবে বাছাই করুন।

১৮. কুসংস্কার কুসংস্কার আসলে ভয়েরই একটি রূপ। এটি অজ্ঞতারও পরিচয় বহন করে। যারা সফল হয় তাদের মন থাকে কুসংস্কারমুক্ত এবং তারা কোনো কিছুতে ভয় পায় না।

১৯. ভুল পেশা বাছাই : যে লোক যে কাজ পছন্দ করে না সেই পেশা যদি গড়ে তুলতে চায় তাহলে সে সফল হয় না। আপনাকে এমন কোনো পেশা বেছে নিতে হবে যাতে মনপ্রাণ লাগিয়ে কাজ করতে পারেন।

২০. কাজে অমনোযোগ : সবজান্তারা এমন ভাব করে যেন তারা সব জানে এবং সব কাজ পারে। আপনি বরং শুধু একটি কাজে আপনার সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন।

২১. অহেতুক খরচ যাদের অহেতুক খরচ করার প্রবণতা রয়েছে তারা জীবনে সফল হতে পারে না। যা আয় করবেন তার কিছুটা সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন।

২২. উৎসাহের অভাব : উৎসাহের অভাব থাকলে একজন মানুষ কী করে কাজ করবে? উৎসাহ জিনিসটি সংক্রামক, যার ভেতরে এ গুণটি রয়েছে তাকে সবাই নিজেদের দলে পেতে চায়।

২৩. অসহিষ্ণুতা : অসহিষ্ণুতা মানেই হলো জ্ঞান অর্জনে অনীহা। ধর্ম, বর্ণ এবং রাজনৈতিক মতভেদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর এ উপাদানটি বিরাজমান।

২৪. অসংযমী : যারা পেটুক, মদ্যপ এবং যৌন সম্পর্কে কোনো বাছবিচার নেই তারাই অসংযমী। এসব বিষয় খুব বেশি প্রশ্রয় দিলে তা সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

২৫. নিজের চেষ্টায় যে ক্ষমতা অর্জিত হয় না : সম্পদশালী বাবা-মায়ের সন্তানেরা এই ক্যাটাগরিভুক্ত। তারা উত্তরাধিকার সূত্রে টাকা-পয়সা পেয়ে তা যথেচ্ছভাবে উড়িয়ে দেয়। যারা কোনোরকম পরিশ্রম ছাড়াই ক্ষমতা হাতে পেয়ে যায় তারা প্রায়ই অসফল হয়। হঠাৎ ধনী হওয়া দারিদ্র্যের চেয়ে বিপজ্জনক।

২৬. অন্যদেরকে সহযোগিতা করার মনোভাবের অভাব : বহু লোক তাদের জীবনে অবস্থান এবং বড় বড় সুযোগ হারিয়ে ফেলে নিজেদের দোষেই। কারণ তাদের ভেতরে অন্যদেরকে সহযোগিতা করার মনোভাবের বড্ড অভাব। এ দোষে দোষীজনকে কোনো ব্যবসায়ী কিংবা অন্য কেউ মেনে নেবেন না।

২৬. অসততার মনোভাব : সততার বিকল্প নেই। অনেকে পরিস্থিতি এবং পরিবেশের চাপে পড়ে অসৎ হয়। এতে অবশ্য সমাজের বড় ধরনের ক্ষতি হয়

না। কিন্তু যে মানুষ জন্মগতভাবেই অসৎ অর্থাৎ সবসময়ই ইচ্ছাকৃতভাবে অসততার আশ্রয় নেয় তার জন্য আসলে কোনো আলো নেই। এর ফলও তাকে শেষ পর্যন্ত ভোগ করতে হয়। সে তার সুখ্যাতি হারিয়ে ফেলে, এমনকী স্বাধীনতা থেকেও সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

২৮. **অহংবোধ :** অহংবোধ থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায় না। সাফল্যের পথে ইগো প্রবলেম একটি বড় বাধা।

২৯. **ভাবনাচিন্তার বদলে শুধু অনুমান করতে থাকা :** বেশিরভাগ মানুষই বড্ড অলস। তারা চিন্তা ভাবনা করে ফ্যাক্টস অর্জনের বদলে শুধু অনুমান করতে ভালোবাসে।

৩০. **পুঁজির অভাব :** যারা জীবনে প্রথমবার ব্যবসায় নামতে যায় তাদের ব্যর্থ হওয়ার সাধারণ একটি কারণ হলো পুঁজির অভাব। পুঁজির ঘাটতি থাকলে এ ভুলের শক সহ্য করা বেশ কঠিন বটে।

এই যে ৩০টি ব্যর্থতার কারণ বলা হলো, এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখুন এর মধ্যে কোন কোন কারণ আপনার ব্যর্থার জন্য দায়ী। বিশ্লেষণটি একাই করুন। বেশিরভাগ মানুষই অন্যরা যেভাবে দোষ খুঁজে পায় তা নিজেরা পায় না।

সক্রেটিস বলে গেছেন 'নিজেকে জানো!' আপনি মার্কেটে সফলভাবে পণ্য সরবরাহ করতে হলে আগে ওই পণ্যটিকে ভালোভাবে চিনতে বুঝতে হবে। মার্কেটিং বা বাজারজাত কীভাবে করবেন তাও জানতে হবে।

নিজেকে জানার জন্য আত্ম-বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন

১. আমি এ বছরের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করেছিলাম তা কি পেয়েছি?

২. আমি যে সেবা দিতে সফল সেরকম সেবা কি দিতে পেরেছি কিংবা এই সেবার কোনো অংশের কি উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছি?

৩. আমি যতটুকু করতে সক্ষম সেই পরিমাণ সার্ভিস কি দিয়েছি?

৪. আমার আচার-আচরণ কি সর্বদা সুর-ছন্দময় এবং সহযোগিতামূলক ছিল?

৫. কাজে গড়িমসি করার কারণে কি আমার দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে এবং পেলেও সেটা কতটুকু?

৬. আমি কি আমার ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছি? পারলেও সেটা কতটুকু?

৭. আমি আমার কাজ শেষ করার জন্য লেগেছিলাম?

৮. আমি কি সবকিছুতেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি?

৯. ভয়ের ছয়টি মূল ভিত্তির কারণে কি আমার কাজে দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে?

১০. আমি কি অতিরিক্ত সতর্ক কিংবা অসতর্ক ছিলাম?

১১. আমার সহযোগিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ভালো ছিল নাকি মন্দ? যদি মন্দ থাকে তবে কি দোষটা তাদের নাকি পুরোটাই আমার?

১২. মনোযোগের অভাবে কি আমার শক্তির অপচয় ঘটিয়েছে?

১৩. আমি কি সকল বিষয়ে খোলা মন এবং ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছি?

১৪. কর্মক্ষেত্রে আমি আমার দক্ষতা কোন দিকে উন্নয়ন ঘটিয়েছি?

১৫. আমি কি আমার কোনো অভ্যাসে অসংযমের পরিচয় দিয়েছি?

১৬. আমি কি প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে আমার অহং প্রকাশ করেছি?

১৭. আমি আমার সহযোগিদের সঙ্গে কি এমন কোনো আচরণ করেছি যাতে তারা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে?

১৮. আমার মতামত এবং সিদ্ধান্তগুলো কি অনুমানভিত্তিক ছিল নাকি চিন্তা

ভাবনা ও বিশ্লেষণের ফসল ছিল?

১৯. আমি কি আমার সময়, খরচ এবং উপার্জন বাজেট করে চলার অভ্যাসটি অনুসরণ করেছি? নাকি এসব বাজেটের বিষয়ে রক্ষণশীল ছিলাম?

২০. আমি বেহুদা কাজে কতটা সময় নষ্ট করেছি যেটা অন্য কাজে ব্যয় করলে অনেক লাভবান হতে পারতাম?

২১. আমি আমার সময় আবার নতুন করে বাজেট করব যাতে সামনের বছরটি আরো দক্ষতার সঙ্গে চালিত করতে পারি?

২২. আমি কি এমন কোনো কাজ করে অপরাধ বোধে ভুগছি যাতে আমার বিবেকের সায় ছিল না?

২৩. আমি কি কারো সঙ্গে অসদাচারণ করেছি, করলেও কীভাবে?

২৪. আমি কি সঠিক পেশায় রয়েছি? যদি না থাকি তবে কেন নেই?

২৫. সাফল্যের মৌলিক সূত্রগুলোতে আমার বর্তমান রেটিং কোথায়?

এ লেখাটি পড়ার পরে আপনি আপনার ব্যক্তিগত কাজ কীভাবে মার্কেটিং করবেন তার একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করে ফেলুন। এ অধ্যায়ে পার্সোনাল সার্ভিস বিক্রির পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে, কীভাবে নেতৃত্ব অর্জন করা যায় তার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, নেতৃত্বে ব্যর্থতার কারণগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, জীবনে কেন আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন তার মূল কারণগুলোও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে, কীভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ করবেন সে বিষয়েও ইংগিত দেয়া হয়েছে। পার্সোনাল সার্ভিস মার্কেটিং করে যারা ধনী হতে চায় তাদের এই বিশ্লেষণগুলো খুবই কাজে লাগবে। যারা সব খুইয়েছেন এবং যারা মাত্রই শুরু করতে যাচ্ছেন, এরা সকলেই এ লেখাটি পড়ে উপকৃত হবেন আশা করা যায়।

এগারো

সিদ্ধান্ত

ধনী হওয়ার সপ্তম পদক্ষেপ

২৫,০০০ নারী-পুরুষকে নিয়ে নিখুঁত বিশ্লেষণ শেষে এ তথ্যটিই বেরিয়ে আসে যে ব্যর্থতার জন্য দায়ী যে ৩০টি প্রধান কারণের তালিকা করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো সিদ্ধান্তের অভাব। সিদ্ধান্তের অপর পিঠ হলো কোনো কাজ করতে গড়িমসি করা। এ সাধারণ শত্রুটিকে সকল মানুষেরই পরাজিত করা প্রয়োজন।

এ বইটি পড়া শেষ হলে আপনি সুনির্দিষ্ট এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ অর্জন করতে পারলেন কিনা তার একটি পরীক্ষা করার সুযোগ পাবেন।

শত শত সফল মানুষ, যারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় করেছেন তাঁদেরকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি তথ্য বেরিয়ে এসেছে আর তা হলো এরা সকলেই ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে জানতেন এবং সেই সিদ্ধান্ত যদি বদল করতে হতো তা হলে তা করতেন ধীরেসুস্থে। যারা টাকা আয় করতে ব্যর্থ হয় তারা সিদ্ধান্তে পৌছায় অতি মন্থর গতিতে অথবা সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে বিদ্যুৎ গতিতে।

হেনরি ফোর্ডের অন্যতম একটি গুণ ছিল তিনি দ্রুত এবং সুনির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং সেগুলো পরিবর্তনের দরকার হলে কাজটি করতেন রয়েসয়ে। আর এতে তিনি অত্যন্ত সংকল্পবদ্ধ থাকতেন বলে সকলে তাঁকে জিদ্দি এবং একগুঁয়ে বলে সম্বোধন করত। তিনি গাড়ি তৈরি শুরু করেন 'T' মডেল দিয়ে। অনেকেই তাঁকে এ মডেল বদলাতে বলেছিল কিন্তু তিনি কারো কথায় কান দেননি।

বেশিরভাগ মানুষই তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ উপার্জনে ব্যর্থ হয়। এর কারণ তারা অন্যদের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়। আপনি যদি অপরের সিদ্ধান্ত দ্বারা চালিত হন তাহলে জীবনেও উন্নতি করতে পারবেন না। কারণ **অপরের দ্বারা চালিত হওয়ার মানে হলো আপনার নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।**

আপনি আপনার 'মাস্টার মাইণ্ড' গ্রুপ ছাড়া অন্য কারো কথা **শুনবেন না।**

আর এ দলটি নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। **শুধু তাদেরকেই বাছাই করবেন যারা আপনার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সমর্থক।**

বন্ধু হোক বা আত্মীয়-স্বজন, এরা প্রায়ই অন্যের ওপর হাস্যকর সব মতামত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। হাজার হাজার নারী-পুরুষ হীনমন্যতাকে সঙ্গী করে চলে কারণ কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি তার ওপর হাস্যকর মতামত চাপিয়ে দিয়ে তার আত্মবিশ্বাসটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে।

আপনার একটি মস্তিষ্ক আছে এবং সেটি একান্তই আপনার নিজস্ব। এ মস্তিষ্কটি ব্যবহার করে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিন। আপনার যদি অন্য লোকের কাছ থেকে তথ্য নেয়ার প্রয়োজন হয় যা আপনাকে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে, তথ্যগুলো নিয়ে নিন তবে কাউকে কিন্তু আপনার উদ্দেশ্যের কথা বলতে যাবেন না।

অনেকে ভান করে তারা অনেক কিছু জানে। আপনি আপনার চোখ-কান খোলা রাখবেন তবে মুখখানা থাকবে বন্ধ, যদি কিনা সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে চান। যারা বেশি কথা বলে তারা কাজ করে কম। আপনি শুনবার চেয়ে যদি কথাই বলেন বেশি তাহলে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন থেকে আপনি নিজেকে শুধু বঞ্চিতই করছেন না, আপনার পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যগুলোও অপরের কাছে ফাঁস করছেন। আর এরা আপনাকে আনন্দের সঙ্গে পরাজিত করতে চাইবে কারণ এরা আপনাকে ঈর্ষা করে।

মনে রাখবেন আপনি একজন জ্ঞানী-গুণী লোকের সামনে বক বক করতে থাকলে হয় প্রমাণ হবে আপনি প্রচুর জানেন অথবা কিছুই জানেন না। প্রকৃতজ্ঞান প্রদর্শন করতে হয় বিনয় এবং নীরবতার মাঝে।

একটি কথা মনে রাখবেন আপনি যে লোকের সঙ্গে কথা বলছেন সে নিজেও কিন্তু ধনী হবার উপায় খুঁজছে। আপনি যদি ফরফর করে আপনার পরিকল্পনার কথা বলে দেন, পরে অবাক হয়ে দেখবেন ওই লোকটি আগে এগিয়ে গিয়ে আপনাকে আপনার লক্ষ্যচ্যুত করে দিয়েছে। কারণ সে আপনার পরিকল্পনাটিই কাজে লাগিয়েছে।

আপনার প্রথম দিকের সিদ্ধান্তগুলো কাউকে জানাবেন না এবং চোখ-কান খোলা রাখবেন। আপনি কী করতে চান পৃথিবীকে বলুন, তবে আগে এটি দেখিয়ে দিন।

স্বাধীনতা অথবা মৃত্যুতে সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্তের মূল্য নির্ভর করে সাহসিকতার ওপর। বিশ্বে যত বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সভ্যতা, সব কিছুতেই ছিল দারুণ ঝুঁকি, প্রায়ই তাতে ছিল সম্ভাব্য মৃত্যু।

লিংকন যে তাঁর বিখ্যাত মুক্তির ঘোষণা দিয়েছিলেন যা আমেরিকার কালো মানুষদের স্বাধীনতা এনে দেয়, সে ঘোষণার বিরোধী ছিলেন অনেকেই। লিংকনের হাজারো বন্ধু এবং রাজনৈতিক সমর্থকরা তাঁর এ ঘোষণার বিরোধিতা করেছেন। লিংকন জানতেন তাঁর এ ঘোষণা যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র মানব সন্তানের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এ ঘোষণা অবশেষে লিংকনের জীবনও কেড়ে নেয়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিপুল সাহসের প্রয়োজন ছিল।

সক্রেটিস তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র সরে না এসে বিষ পানে মৃত্যুর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা-ও সাহসিকতাময় সিদ্ধান্তই ছিল। তাঁর ওই সিদ্ধান্ত, হাজার বছর পরের মানুষদের চিন্তা এবং বলার স্বাধীনতার অধিকার এনে দিয়েছিল।

জেনারেল রবার্ট ই. লি. যখন ইউনিয়নের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন জানতেন এতে তাঁর নিজের এবং আরো বহু মানুষের জীবন অবসান ঘটতে পারে। তবু তিনি ওই সাহসী সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছিলেন।

তবে আমেরিকানদের জন্য সর্বকালের সেরা সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয় ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই ফিলাডেলফিয়ায় যখন ছাপ্পান্নজন মানুষ একটি ডকুমেন্টে সই করেন এ কথা জেনেই যে এর ফলে হয় সকল আমেরিকান স্বাধীন হবে অথবা তাঁরা ছাপ্পান্নজন ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলবেন।

এ ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হলো এ বিষয়টি বোঝাতে যে আপনি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন তা সাহসিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলে চলবে না। যারা দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁরা জানেন আসলে তাঁরা কী চান এবং তাঁরা তা পেয়েও যান। নেতারা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে

দ্রুত এবং দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে মানুষ জানে সে কী করতে চলেছে তার জন্য পৃথিবী জায়গা করে দেয়।

সিদ্ধান্তহীনতার বিষয়টি সাধারণত কৈশোরকাল থেকেই শুরু হয়। প্রথমে স্কুল, তারপর হাইস্কুল, তারপর কলেজ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তহীনতার অভ্যাস চলে যায়। সকল শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা এটাই যে তারা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি না শেখার কারণে একে অভ্যাসে পরিণত করতে উৎসাহিত করেন।

স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাসটি গড়ে তোলা উচিত। প্রয়োজনে এ বিষয়ে একটি পরীক্ষাও নেয়া যেতে পারে যাতে পাস করা অত্যাবশ্যকীয়।

আমাদের স্কুল-কলেজে পড়াশোনার ঘাটতির কারণে সিদ্ধান্তহীনতার বিষয়টি ছেলেমেয়েদেরকে পেয়ে বসে। তারা বড় হয়ে কী পেশা নেবে তা নিয়ে রীতিমত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকে। এবং বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় কলেজ পাস করা ছাত্র ছাত্রীরা সামনে যে কাজ পায় তাই লুফে নেয়। এর কারণ সিদ্ধান্ত হীনতার অভ্যাস।

প্রতি একশো মানুষের মধ্যে আটানব্বই জনই যে বেতনে কাজ করে বা যে অবস্থানে আছে তা তাদের উপযুক্ত নয়। কিন্তু তারা যে চাকরি করছে কারণ তারা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এবং কোন প্রফেশন চায় তা-ও ঠিক করতে পারেনি।

সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বদাই সাহসের প্রয়োজন। কখনো কখনো বিপুল সাহসেরও দরকার হয়। যে ৫৬ জন মানুষ স্বাধীনতার দলিলে সই করেছিলেন তাঁরা ওই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে কিন্তু নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন। তবে যে মানুষ নির্দিষ্ট কাজটি উদ্ধার করার জন্য নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে, ওই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে তার জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে না। সে আসলে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়।

বারো
ধৈর্য
বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা

ধনী হওয়ার অনর্থ পদক্ষেপ

আকাঙ্ক্ষাকে অর্থের সমর্থক করে তুলতে ধৈর্য বা লেগে থাকার গুণ একটি প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টর। আর ধৈর্যের ভিত হলো **ইচ্ছাশক্তি**।

ইচ্ছাশক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা দু'টিকে যখন একত্রিত করা হয়, পরিণত হয় এক অদম্য জুটিতে। যারা বিপুল বিত্তবৈভবের অধিকারী হন তাদেরকে লোকে চেনে সাধারণত শীতল রক্তের মানুষ হিসেবে, কখনো কখনো তাঁরা নির্দয়ও হয়ে ওঠেন। তবে বেশিরভাগ সময় তাঁদের সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়। আসলে তাঁদের যা আছে তা হলো ইচ্ছাশক্তি। এর সঙ্গে তাঁরা যোগ করেন ধৈর্য এবং এর সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাকে মিলিয়ে নিয়ে তাঁরা নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের পথে এগিয়ে যান।

হেনরি ফোর্ডকে সবাই শীতল রক্তের, নিষ্ঠুর মানুষ বলে অভিহিত করত। এই ভুল ধারণাটি গড়ে ওঠার কারণ তিনি তাঁর সকল পরিকল্পনার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকতেন।

সিংহভাগ মানুষই তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রথমে সোৎসাহে এগিয়ে যায়। কিন্তু কোনো কারণে ভাগ্য তাদেরকে সহায়তা না করলে তারা হাল ছেড়ে দেয়। খুব কম মানুষই সকল বাধা পেরিয়ে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। আর সেই স্বল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে রয়েছেন ফোর্ড, কার্নেগি, রকফেলার এং এডিসনরা।

যারা টাকা কামাতে চায়, সম্পদ গড়তে চায় তাদেরকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে, কোনোভাবেই হাল ছেড়ে দেয়া চলবে না। ধনী হওয়ার জন্য যে তোরোটি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে, ধৈর্য নিয়ে সেগুলো অনুসরণ করতে

হবে।

ধৈর্য যার নেই সে জীবনে সফল হতে পারে না। হাজারো মানুষের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে বেশিরভাগের দুর্বলতাই হলো ধৈর্যের অভাব। তবে চেষ্টা করলে এ দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠো যায়। এ জন্য মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে।

যে কোনো কিছু শুরুর স্টার্টিং পয়েন্টই হলো আকাঙ্ক্ষা। এ কথাটি সর্বক্ষণ মনে রাখবেন। দুর্বল আকাঙ্ক্ষা দুর্বল ফলাফল বয়ে আনে, যেমন ছোট অগ্নিকুণ্ড থেকে অল্প মাত্রার উত্তাপ পাওয়া যায়। আপনার ভেতরে যদি ধৈর্যের অভাব থাকে, আকাঙ্ক্ষার নিচে শক্তিশালী আগুন জ্বেলে নিয়ে সে দুর্বলতা দূর করুন।

সম্পদ তাদের দিকে ধাবিত হয় যারা সম্পদকে নিজেদের প্রতি আকর্ষিত করতে পারে, যেমন নদী ধেয়ে যায় সাগরের টানে।

আপনার যদি মনে হয় আপনার ধৈর্যের বড্ড অভাব তবে এ বইয়ের যে অধ্যায়ে Power-এর কথা বলা হয়েছে সেই অধ্যায়টি ভালো করে পড়ুন এবং মাস্টারমাইন্ড গ্রুপের সঙ্গে চলাফেরা করতে থাকুন। এ দলটির সদস্যদের সহায়তায় আপনি নিজের মধ্যে ধৈর্য গড়ে তুলতে পারবেন। অটো-সাজেশনের অধ্যায়ে ধৈর্য বৃদ্ধির কিছু পরামর্শ দেয়া হয়েছে তা-ও অনুসরণ করতে পারেন। এ অধ্যায়গুলোতে যেসব নির্দেশ বা পরামর্শ দেয়া হয়েছে তা অনুসরণ করতে থাকুন, আপনার অবচেতন মনে আপনার আকাঙ্ক্ষার জিনিসটির পরিষ্কার ছবি ফুটিয়ে তুলুন। দেখবেন তারপর থেকে আপনার মধ্যে আর ধৈর্যের অভাব ঘটবে না। আপনি জেগে থাকেন কিংবা ঘুমিয়ে, আপনার অবচেতন মন কিন্তু সারাক্ষণই কাজ করে চলেছে।

ধৈর্য নিয়ে আসবে সাফল্য

যদি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আপনি আপনার 'মাস্টার মাইন্ড' দলটিকে নির্বাচন করতে পারেন, অন্তত: একজন মানুষ আপনার ধৈর্যের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করবে। যারা ধন সম্পদের মালিক হয়েছেন তারা এ কাজটি করেছেন। তারা ধৈর্যের অভ্যাস গড়ে তুলেছেন কারণ পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁদেরকে ধৈর্যশীল হতে বাধ্য করেছে।

ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই! অন্য কোনো কোয়ালিটি দিয়ে একে দখল বা উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। শুরু করার পরে যখন কোনো কাজ কঠিন এবং মন্থরগতির মনে হবে তখন এ কথাটি স্মরণ করবেন। যারা নিজেদের মধ্যে ধৈর্যের অভ্যাসটি গড়ে তুলতে পেরেছেন তাঁরা একে ইনসিওরেন্স হিসেবে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন। তারা যতবারই ব্যর্থ হোন না কেন, প্রতিবারই উঠে দাঁড়িয়ে শেষে মইয়ের সর্বোচ্চ ধাপে আরোহন করেছেন।

মাঝে মাঝে মনে হয় অদৃশ্য কোনো একজন গাইড আছে তার কাজ হলো সকল ধরনের হতাশাজনক অভিজ্ঞতার মাঝে মানুষকে পরীক্ষা করে দেখা। যারা পরাজয়ের পরেও উঠে দাঁড়ায় এবং সামনে এগুতে থাকে, তাদেরকে দেখে পৃথিবী বলে ওঠে, 'ব্রাভো!' জনতাম তুমি এটা পারবে।' এই অদৃশ্য গাইডটি ধৈর্যের পরীক্ষা দেয়া ছাড়া কাউকে কিছু অর্জন করতে দেয় না। যারা এ পরীক্ষাতে অংশ নিতে পারে না তারা জীবনে কিছুই পায় না।

আর যারা এ পরীক্ষায় অংশ নেয় তারা যথেষ্টই ধৈর্যের পুরষ্কার লাভ করে। তারা যা চাইবে তা পেয়ে যায়।

ফ্যানি হার্স্ট নামে এক নারীর গল্প বলি যিনি ১৯১৫ সালে নিউইয়র্কে এসেছিলেন ব্রডওয়েতে নাটক লেখার অভিপ্রায়ে। কিন্তু চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কোনো প্রযোজক তার নাটক করতে আগ্রহ বোধ করেননি। ফ্যানি কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি। তিনি চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

এক পাবলিশার্স (স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট) ফ্যানির লেখা ছত্রিশবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবুও ধৈর্যচ্যুত ঘটেনি ফ্যানির। অবশেষে চলচ্চিত্রের

লোকজন তাঁর বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। ফ্যানির লেটেস্ট উপন্যাস 'Great Laughter' এর পিকচার রাইট তারা কিনে নেয় এক লক্ষ ডলারে। বইটি কিন্তু তখনো বাজারে আসেনি। ওই সময় অপ্রকাশিত একটি গ্রন্থের চিত্রস্বত্ব এত বিপুল পরিমাণ অর্থে কিনে নেয়ার ঘটনা ওটাই প্রথম। আর বই প্রকাশিত হওয়ার পরে ফ্যানি রয়ালিটি পেয়েছিলেন এরচেয়েও বেশি।

মনের অন্যান্য সকল অবস্থার মতো ধৈর্যও গড়ে ওঠে বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট কারণকে ভিত্তি করে।

১. **দ্ব্যর্থহীন উদ্দেশ্য:** আপনি কী চাইছেন সেটা জানতে হবে সবার আগে, ধৈর্যের উন্নতি ঘটাতে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একটি সুদৃঢ় মোটিভ অনেক কাঠিন্যই দূর করে দিতে পারে।

২. **আকাঙ্ক্ষা:** প্রবল আকাঙ্ক্ষার পেছনে লেগে থাকতে পারলে ধৈর্য এমনিতেই অর্জিত হবে।

৩. **আত্মনির্ভরতা:** একটি পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো সাহস যদি মনে থাকে, থাকে বিশ্বাস, তাহলে ধৈর্য সহকারে সেই পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে হবে।

৪. **দ্ব্যর্থহীন পরিকল্পনা** সুসংগঠিত পরিকল্পনা, তা যদি দুর্বলও হয় এবং অবাস্তব, তবু ধৈর্য নিয়ে এগোনো যেতে পারে।

৫. **নিখুঁত জ্ঞান :** যদি পরিকল্পনা হয় অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নিখুঁত তবে তা ধৈর্যকে উৎসাহিত করে। 'অনুমান' না করে জেনে বুঝে কাজ করবেন, নইলে ধৈর্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬. **সহযোগিতা :** সহযোগিতা, একে অপরকে বুঝতে পারা এবং একত্রে কাজ করার মানসিকতা অন্যদেরকে ধৈর্যের উন্নয়ন ঘটায়।

৭. **ইচ্ছা শক্তি :** নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে পরিকল্পনা করে তাতে মনোযোগ প্রদান ধৈর্যেরই নামান্তর।

৮. **অভ্যাস :** ধৈর্য হলো অভ্যাসের প্রত্যক্ষ ফল। মনের ভেতরে যা প্রয়োগ করানো হয় তা মন হজম করে এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে। সাহস দিয়ে মানুষের প্রধান শত্রু ভয়কে জয় করা যায়।

ধৈর্যের অভাবের লক্ষণসমূহ

১. একজন মানুষ যখন বুঝতে পারে না আসলে সে কী চায়।

২. কারণ ছাড়া বা কারণ নিয়েই কাজে গড়িমসি করা।

৩. বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনে অনাগ্রহ।

৪. সবকিছুতেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকা।

৫. সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরির বদলে অ্যালিবাইর ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠার অভ্যাস।

৬. আত্মতুষ্টি। যারা আত্মতুষ্টিতে ভোগে তারা জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

৭. ঔদাসীন্য।

৮. যে কোনো ভুলের জন্য অপরকে দোষারোপের চেষ্টা এবং প্রতিকূল ঘটনাকে এড়ানো যেতো না বলে মেনে নেয়ার অভ্যাস।

৯. আকাঙ্ক্ষার দুর্বলতা।

১০. পরাজয়ের প্রথম ইঙ্গিতেই হাল ছেড়ে দেয়া।

১১. সুসংগঠিত পরিকল্পনার অভাব। এসব পরিকল্পনা লিখে নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু ধৈর্যহীনরা তা করে না।

১২. আইডিয়া অনুসারে না চলার অভ্যাস কিংবা নিজে থেকে সুযোগ এলেও তা ধরতে চেষ্টা না করা।

১৩. ইচ্ছা করার বদলে কিছু পাবার আশা করা।

১৪. ধনী হতে চাইবার বদলে দারিদ্র্য মেনে নেয়া। ধৈর্যহীনদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়টি খুব কমই থাকে।

১৫. কত শর্টকাটে ধনী হওয়া যায় তার চেষ্টা করা।

১৬. সমালোচনার ভয়। পাছে লোকে কিছু বলে এই ভয়ে অনেকেই পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হয় এবং সেগুলো কাজেও লাগাতে পারে না। এ শত্রুটির কথা তালিকার সবার ওপরে স্থান দেয়া উচিত কারণ, এটি অনেকেরই অবচেতন মনে ঘাপটি মেরে থাকে অথচ লোকে তা বুঝতেও পারে না।

সমালোচনার ভয় নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। অনেকেই আছে যারা তাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব দ্বারা এমনভাবে পরিবৃষ্ট হয়ে থাকে যে নিজেদের মতো করে জীবন যাপন করতে পারে না। এর কারণ হলো এ মানুষগুলো সমালোচনা ভয় পায়।

প্রচুর মানুষ আছে যারা বিয়ে করে ভুল করে এবং অসুখী, দুর্দশাময় একটি জীবন যাপন করে কারণ, তারা সমালোচনাকে ভয় পায়। তারা ভাবে তাদের ভুলগুলো শোধরাতে গেলে যদি সমালোচনার শিকার হতে হয়।

লাখ লাখ মানুষ বয়স্ক শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না সমালোচনার ভয়ে। অথচ এরা ছোটবেলায় হয়তো নানান কারণে পড়াশোনার সুযোগ পায়নি যে সুযোগটি বয়সকালে এসেছে। অসংখ্য নারী-পুরুষ কর্তব্য পালনের নামে নিজেদের জীবন ধ্বংস করে দেয় তা-ও এই সমালোচনার ভয়ে।

লোকে ব্যবসায়ে ঝুঁকি নিতে চায় না কারণ, তারা ভয় পায় এ কথা ভেবে যে ব্যর্থ হলে অন্যরা তাদের সমালোচনা করবে। কিছু কিছু এমন ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠে সমালোচনার ভয়।

বহু লোক আছে নিজেদের জন্য বড় কোনো লক্ষ্য স্থির করতে চায় না এমনকী ক্যারিয়ার গঠনেও অবহেলা দেখায়। কারণ, তারা এ কথা ভেবে ভয় পায় যে তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব তাদেরকে বলতে পারে, 'অত উঁচু আশা কোরো না, লোকে তোমাকে পাগল ভাববে।'

এন্ড্রু কার্নেগি যখন আমাকে বলেছিলেন কুড়ি বছর ধরে আমাকে ব্যক্তি মানুষের কাছে যেতে হবে তাদের জীবনের অর্জন কীভাবে হলো জানার জন্য, সবার আগে আমার মনে এ ভাবনাটিই এসেছিল যে লোকে কী ভাববে। লোকের সমালোচনার ভয়ে আমি এ কাজটি কীভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় সেরকম কোনো অজুহাতই খুঁজছিলাম। আমার ভেতর কেউ একজন বলছিল, 'তুমি এই বিশাল কাজটি করতে পারবে না কারণ এতে সময় লাগবে প্রচুর। তাছাড়া তোমার আত্মীয়-স্বজনই বা তোমাকে কী বলবে? তুমি পয়সা জমাবে কীভাবে? কেউই সাফল্যের দর্শন তৈরি করে বসে নেই। তুমিই বা এসব বিশ্বাস করে যাবে কোন অধিকারে? আর তুমি কে হে, যে এত বড় বড় স্বপ্ন দেখছ? তুমি গরীব ঘরের ছেলে সে কথাটি মাথায় রেখো। দর্শন সম্পর্কে তুমি কী জানো? লোকে ভাববে তুমি একটা পাগল এবং সত্যি তারা তাই ভেবেছিল—অন্য লোকেরা কেন এ কাজটি আগে করেনি?'

এরকম অসংখ্য প্রশ্নে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল গোটা পৃথিবী আমাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিয়েছে এবং আমার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে।

ওই অ্যামবিশনটি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করার আগেই ওটাকে ত্যাগ করার সুযোগ আমার ছিল। কিন্তু আমি তা করিনি। পরবর্তীতে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছিলাম বেশিরভাগ আইডিয়াই জন্ম নেয় মৃত অবস্থায়। **তাৎক্ষণিক অ্যাকশনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে এদের ভেতরে জীবনের নিঃশ্বাস প্রবেশ করাতে হয়।** জন্মের সময়ই একটি আইডিয়ার যত্ন নেয়ার প্রয়োজন। সমালোচনার ভয় বেশিরভাগ আইডিয়াকে ধ্বংস করে দেয় এবং তারা কখনো **পরিকল্পনা** ও **অ্যাকশনের** স্তরে পৌঁছাতে পারে না।

অনেকেই বিশ্বাস করে জাগতিক সাফল্য হলো সুবিধাজনক 'ব্রেক' এর ফলাফল। তবে এ ব্রেক কিন্তু নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর এবং এটি খুব কমই ঘটে। 'ব্রেক' এমনি এমনি আসে না, একে সৃষ্টি করতে হয়।

অর্থনৈতিক মহামন্দার সময় কমেডিয়ান ডব্লু সি ফিল্ডস তাঁর সমস্ত টাকা পয়সা খুইয়ে ফেলেছিলেন। তিনি বেকার হয়ে পড়েন। তাঁর বয়স তখন ষাট ছাড়িয়েছে, যে বয়সে অনেকেই নিজেদেরকে 'বুড়ো' বলে ভাবে। তবে ফিল্ডস কাজে ফিরতে এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে একটি সিনেমায় তিনি বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'র মতো তিনি পড়ে গিয়ে ঘাড়ে বেদম চোট পান। অন্য কেউ হলে এতসব প্রতিকূলতা সয়ে অভিনয় করার চিন্তাই করত না, হাল ছেড়ে দিত। কিন্তু ফিল্ডসের ধৈর্য ছিল অসীম। তিনি জানতেন লেগে থাকলে আজ হোক বা কাল, একটা 'ব্রেক' অবশ্যই পাবেন। তিনি সেই 'ব্রেক' পেয়েছিলেন তবে ভাগ্য তাঁকে সুযোগটা এনে দেয়নি।
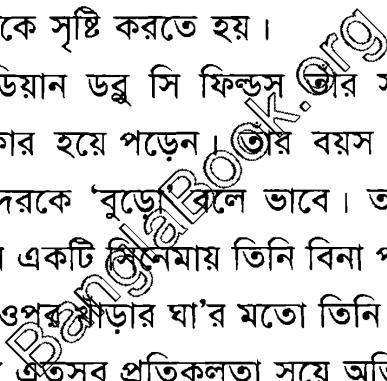
মেরি ড্রেসলারও তাঁর ষাট বছর বয়সে সমস্ত টাকা-পয়সা খুইয়ে কপর্দকহীন হয়ে পড়েন। তিনিও 'ব্রেক'এর আশায় ছিলেন এবং তা পেয়েছিলেন। তাঁর ধৈর্যই তাঁকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় যে বয়সে কিনা অনেকের মধ্যেই কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না।

১৯২৯ সালের স্টক ক্রাশে এডি ক্যান্টনের সমস্ত টাকা পয়সা উবে যায় তবে তাঁর ধৈর্য এবং সাহস উবে যায়নি। তিনি এ দুটিকে কাজে লাগিয়ে আবার ফিরে আসেন এবং তাঁর সাপ্তাহিক ইনকাম তখন ছিল দশ হাজার ডলার। আসলে 'ব্রেক' জিনিসটা নিজেকেই তৈরি করতে হয়, ওটা এমনিই হেঁটে আসে না।

আপনি একশো মানুষের সঙ্গে কথা বলুন এবং জিজ্ঞেস করুন তারা জীবনে সবচেয়ে বেশি কোন জিনিসটি চায়, আটানব্বই শতাংশ আপনার প্রশ্নের জবাবই দিতে পারবে না। তবে উত্তর পাবার জন্য যদি আপনি ওদেরকে চেপে ধরেন তাহলে হয়তো কেউ বলবে সে চায় নিরাপত্তা, অনেকেই বলবে টাকা, অল্প কিছু মানুষ চাইবে সুখ, অন্যরা বলবে তারা চায় খ্যাতি ও ক্ষমতা এবং আরো কিছু চাইবে সামাজিক স্বীকৃতি, সহজ জীবনযাপন, গান করা, নাচ করা এবং লেখা। তবে এদের কেউই এই টার্মগুলো সংজ্ঞায়িত করতে পারবে না কিংবা এ ইচ্ছেগুলো কীভাবে বাস্তবায়িত করবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দিতেও ব্যর্থ হবে। তবে ধনী মানুষরা ইচ্ছার প্রতি সাড়া দেন না। তাঁরা শুধু সাড়া দেন নির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রতি যে পরিকল্পনা ধৈর্য নিয়ে নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

ধৈর্যের উন্নতি ঘটাবেন কীভাবে

চারটি সাধারণ পদক্ষেপ অনুসরণ করলেই আপনি আপনার ধৈর্যের উন্নতি ঘটাতে পারবেন। প্রয়োজনীয় সেই পদক্ষেপগুলো হলো

১. তীব্র আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য।

২. একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা যাকে নিয়মিত অ্যাকশনে নিয়ে যেতে হবে।

৩. নিরুদ্যম প্রভাব এবং সকল নেতিবাচক চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে মনকে শক্ত করে বন্ধ রাখা। এর সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত জনদের পরামর্শও সংযুক্ত হবে।

৪. এক বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যারা পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ যোগাবে।

জীবনে সাফল্য লাভ করতে চাইলে এই চারটি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজনীয়। যে তেরোটি মূল নীতির কথা বলা হয়েছে সেগুলো অর্জন করা সম্ভব যদি এই চারটি পদক্ষেপকে অভ্যাসে পরিণত করা যায়। এ পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে একজন মানুষ তার অর্থনৈতিক নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ পদক্ষেপগুলো চিন্তার স্বাধীনতার প্রতি মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এসব পদক্ষেপ মানুষকে ধনী হতে সাহায্য করে। এগুলো এগিয়ে নিয়ে যায় ক্ষমতা, খ্যাতি এবং বিশ্ব স্বীকৃতির পাশে। এই চারটি পদক্ষেপ অনুকূল 'ব্রেক' এর নিশ্চয়তা দেয়। এই পদক্ষেপগুলো স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়। এই পদক্ষেপগুলো ভয়, নিরুৎসাহ এবং ঔদাসীন্যকেও জয় করে।

শেষ মহানবী
টমাস সার্জের রিভিউ

হযরত মোহাম্মদ (সা:) একজন নবী ছিলেন। তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাতেও তিনি শিক্ষিত হতে পারেননি, চল্লিশের আগে তিনি তাঁর মিশন শুরু করেননি। তিনি যখন ঘোষণা করেন তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী, প্রকৃত ধর্মের বাণী নিয়ে এ দুনিয়ায় এসেছেন, তখন সবাই তাঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছে, তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে। শিশুরা তাঁকে মাটিতে হোঁচট খাইয়ে ফেলেছে, মহিলারা ময়লা আবর্জনা ছুড়ে মেরেছে গায়ে। তাঁকে তাঁর নিজের শহর মক্কা থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দেয়।

মোহাম্মদের জন্ম মক্কার এক নেতৃত্বস্থানীয় পরিবারে। মক্কা তখন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। ওখানকার শিশুরা মরুভূমিতে বেদুইন দ্বারা লালিত পালিত হতো। যাযাবর মায়েদের দুধ খেয়ে বড় হয়েছিলেন মোহাম্মদ। তিনি মেষও চড়াতেন। মোহাম্মদ প্রাচ্যের বহুদেশ ভ্রমণ করেন, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী লোকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং লক্ষ্য করেন খ্রিস্টিয়ান ধর্মের মানুষজন নানান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় বিধবা নারী খাদিজা মোহাম্মদকে খুব পছন্দ করতেন, তিনি তাঁকে বিয়ে করেন। যদিও খাদিজার বাবা এ বিয়ের বিপক্ষে ছিলেন। পরবর্তী বারো বছর মোহাম্মদ একজন ধনী ও কৌশলী ব্যবসায়ী হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেন। তারপর তিনি মরুভূমিতে ঘুরতে বের হন এবং একদিন কোরআনের প্রথম আয়াত নিয়ে ফিরে আসেন এবং খাদিজাকে বলেন, ফেরেশতা জিবরাইল তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং বলেছেন মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত নবী।

'আল্লাহর বাণী কোরআন ছিল মোহাম্মদের জীবনের এক অলৌকিক ঘটনা। তিনি কোনো কবি ছিলেন না; কিন্তু কোরআনের আয়াতগুলো তিনি বিশ্বাসীদেরকে এমন সুমধুর ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে শোনান যা পেশাদার কবিদের পক্ষেও সম্ভব নয়। আরবদের কাছে এটি ছিল একটি অলৌকিক ঘটনা। তাদের কাছে

কোরআনের এই আয়াতগুলো ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার, কবি ছিলেন সর্ব শক্তিমান। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহর চোখে সকল মানুষ সমান এবং পৃথিবী হওয়া উচিত একটি গণতান্ত্রিক ইসলামি রাষ্ট্র।

ইসলামের উত্থান শুরু হয়ে যায়। মোহাম্মদ ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে আহ্বান করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যোগদানের জন্য। কারণ তিনি শুধু একটি নতুন ধর্মই তৈরি করছিলেন যারা এক আল্লাহতায়ালায় বিশ্বাসী তিনি তাদেরকে তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে বলেন। ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে ইসলাম বিশ্বজয় করে ফেলত। কিন্তু তারা তা করেনি। তারা মানবযুদ্ধে মোহাম্মদের আমন্ত্রণও গ্রহণ করেনি। নবীর বাহিনী যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করে তখন একটি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেনি তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের কারণে।

(ঈষৎ সংক্ষেপিত)

তেরো

মাস্টার মাইন্ডের ক্ষমতা

চালিকা শক্তি

ধনী হওয়ার নবম পদক্ষেপ

অর্থ উপার্জনের জন্য শক্তির প্রয়োজন। যদি যথেষ্ট শক্তি না থাকে এবং তাকে অ্যাকশনে নামানো না যায় তাহলে পরিকল্পনা করেও কোনো লাভ হয় না। এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে কীভাবে একজন মানুষ শক্তি পেতে এবং তাকে কাজে লাগাতে পারে।

শক্তিকে 'সংগঠিত এবং বুদ্ধিদীপ্তভাবে পরিচালিত জ্ঞান' বলা চলে। এখানে শক্তিকে সংগঠিত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যা একজন ব্যক্তি মানুষকে আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করে অর্থের সমার্থক হয়ে উঠতে পারে। অর্গানাইজড এফোর্ট বা সংগঠিত প্রচেষ্টা দুই বা ততোধিক মানুষের সম্মিলিত কর্মের দ্বারা সৃষ্টি হয় যারা একত্রে কাজ করে একটি সুনির্দিষ্ট সমাপ্তির জন্য।

শক্তি কীভাবে অর্জন করা যায় তা নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক। শক্তি যদি 'সংগঠিত জ্ঞান' হয়ে থাকে তবে জ্ঞানের সোর্স বা উৎসগুলো পরীক্ষা করে দেখি:

ক. অসীম জ্ঞান এ জ্ঞান অর্জন করা যায় সৃষ্টিশীল কল্পনার সাহায্যে যার কথা পূর্বেই কোনো অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কথা যে কোনো গণগ্রন্থাগারে পাওয়া যেতে পারে। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার একটি অংশ পাবলিক স্কুল এবং কলেজে পড়ানো হয়, যেখানে এটি ক্ল্যাসিফায়েড এবং অর্গানাইজ করা হয়।

গ. এক্সপেরিমেন্ট এবং রিসার্চ : বিজ্ঞান এবং মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ একত্রিত হয়ে ক্ল্যাসিফাই করছে এবং প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য সংগঠিত করছে। যখন 'সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞান সহজলভ্য নয় তখন এ সোর্সটিকে কাজে লাগাতে হবে। এখানেও প্রায়ই সৃজনশীল কল্পনাকে ব্যবহার করা হয়।

পূর্ববর্তী যে কোনো সূত্র থেকেই জ্ঞান আহরণ করা চলে। একে নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় সংগঠিত করে শক্তিতে রূপান্তর ঘটানো সম্ভব এবং সেই প্ল্যানগুলো নিয়ে অ্যাকশনে নামতে হবে। জ্ঞানের এ তিনটি সূত্র যে কোনো মানুষের অসুবিধাগুলো দূর করে দেবে যদি সে নিজের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল থাকে এবং জ্ঞান আহরণ করে তা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারে। তার পরিকল্পনাগুলো যদি হয় সমন্বিত এবং বৃহৎ তাহলে তাকে অন্যদের সাহায্য নিতে হবে।

'মাস্টার মাইন্ড' এর মাধ্যমে শক্তি অর্জন

মাস্টার মাইন্ডকে ব্যাখ্যা করা যায় 'জ্ঞান ও প্রচেষ্টার সমন্বয়, একটি সুর ও ছন্দের গতি যেটি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দুই বা ততোধিক লোকের মধ্যে মিল ঘটে বা তারা মিলিতভাবে কাজ করে।'

'মাস্টার মাইন্ড'এর সাহায্য ছাড়া ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বিরাট কোনো শক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। আগের অধ্যায়গুলোতে পরিকল্পনা কীভাবে তৈরি করে তা আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তর ঘটানো যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আপনি যদি বুদ্ধি এবং ধৈর্য সহকারে এসব নির্দেশ মেনে চলেন এবং আপনার 'মাস্টার মাইন্ড' গ্রুপের নির্বাচনে পার্থক্য ব্যবহার করতে পারেন, আপনি বুঝে উঠতে পারার আগেই আপনার উদ্দেশ্য অধিকটাই হাসিল হয়ে যাবে।

কাজেই আপনাকে শক্তির 'অকল্পনীয়' সুপ্ত শক্তিগুলোকে বুঝতে হবে এবং সুনির্বাচিত 'মাস্টার মাইন্ড' দলের সাহায্যে। আমরা এখানে মাস্টার মাইন্ড তত্ত্বের দু'টি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব। এর একটি হলো অর্থনৈতিক, অপরটি সাইকিক। অর্থনৈতিক বিষয়টি সুস্পষ্ট। যে লোক তার দলের লোকদের কাছ থেকে উপদেশ, পরামর্শ এবং সহযোগিতা লাভ করে সে অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো সৃষ্টি করতে পারে। এই সম্মিলিত মৈত্রী প্রায় প্রতিটি ফরচুন সৃষ্টির ভিত্তি।

মাস্টার মাইন্ডের সাইকিক বিষয়টি অবশ্য বিমূর্ত। এটি বোঝাও বেশ কঠিন কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আধ্যাত্মিক শক্তি যার সঙ্গে মানব জাতি খুব একটা পরিচিত নয়।

মনে রাখবেন গোটা ব্রহ্মাণ্ডে মাত্র দুটি চেনা উপাদান রয়েছে তার একটি হলো এনার্জি বা শক্তি, অপরটি ম্যাটার বা পদার্থ। সবাই জানে পদার্থ ভাঙলে পাওয়া যায় মলিকিউল, অ্যাটম এবং ইলেকট্রন। ম্যাটারের ইউনিটগুলো আলোপা, বিচ্ছিন্ন এবং বিশ্লেষণ করা যায়।

তেমনি এনার্জির ইউনিট রয়েছে। মানুষের মন এনার্জির একটি আকার, প্রাকৃতিক আধ্যাত্ম্য শক্তির একটি অংশ। যখন দুটি মানুষের মন একই সুর এবং

ছন্দে একত্রিত হয়, প্রতিটি মনের এনার্জির আধ্যাত্ম ইউনিট সৃষ্টি করে একটি ঐক্য। যাতে থাকে মাস্টার মাইন্ডের 'সাইকিক' ফেজটি।

মাস্টার মাইন্ড প্রিন্সিপাল বা এর অর্থনৈতিক দিকটি নিয়ে পঁচিশ বছর আগে প্রথম আমার মনোযোগ সৃষ্টি করেন এন্ড্রু কার্নেগি। এ প্রিন্সিপালটি আবিষ্কার করেই সিদ্ধান্ত নিই আমি আসলে কী কাজ করব।

মি. কার্নেগির 'মাস্টার মাইন্ড' গ্রুপে ছিল প্রায় ৫০ জন লোক। এদের দ্বারা তিনি পরিবৃত্ত থাকতেন। এরা তাঁকে ইস্পাত তৈরি এবং বাজারজাত করণের বিষয়ে পরামর্শ দিত। তিনি এই 'মাস্টার মাইন্ড' গ্রুপের সাহায্যেই ধন-সম্পদ অর্জন করেন।

যারা ধনী হয়েছেন এদের জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখবেন 'তাঁরা প্রত্যেকেই সচেতন কিংবা অচেতনভাবে 'মাস্টার মাইন্ড' গ্রুপ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

এনার্জি হলো প্রকৃতির একটি ইউনিভার্সাল সেট যার সাহায্যে পৃথিবীর জাগতিক সবকিছুই তৈরি হয়েছে, এসবের মধ্যে প্রাণী এবং উদ্ভিদ জীবনও রয়েছে। প্রকৃতি এনার্জিকে ম্যাটারে পরিবর্তন করে। প্রকৃতি যে ব্লকগুলো তৈরি করে তা মানুষের চিন্তাশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের মস্তিষ্ককে ইলেকট্রিক ব্যাটারির সঙ্গে তুলনা করা যায়। এটি বাতাস থেকে সমস্ত শক্তি শুষে নেয় এবং গোটা ইউনিভার্সকে পূর্ণ করে তোলে।

এটা সকলের জানা যে কতগুলো ইলেকট্রিক ব্যাটারির সাহায্যে একটি সিঙ্গেল ব্যাটারির চেয়ে অধিকতর শক্তি উৎপাদন করা যাবে। এটাও সবার জানা যে একটি একক ব্যাটারি কোষের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তির জোগান দেয়।

মস্তিষ্কও একইভাবে কাজ করে। কিছু মস্তিষ্ক অবশ্য অন্যদের চেয়ে অধিকতর কর্মঠ এবং তারা একত্রে কাজ করার মাধ্যমে একটি সিঙ্গেল ব্রেইনের চেয়ে অনেক বেশি চিন্তা-শক্তির জোগান দিতে পারে, যেভাবে কতগুলো ইলেকট্রিক ব্যাটারি মিলে একটি সিঙ্গেল ব্যাটারির চেয়ে অনেক বেশি শক্তি উৎপাদন করতে পারে।

হেনরি ফোর্ড যখন ব্যবসা শুরু করেন ওই সময় তিনি দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং আওতার প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কাজ করছিলেন। তবে দশ বছর বাদে মি. ফোর্ড এই তিনটি বাধা দূর করেন এবং পঁচিশ বছরের মধ্যে আমেরিকার অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁর সঙ্গে টমাস আলভা এডিসনের বন্ধুত্ব ছিল। মি. ফোর্ডের বাণিজ্য আরো প্রসার লাভ করে যখন তিনি হার্ভে ফায়ারস্টোন, জন বারোজ এবং লুথার বারব্যাংকের (এরা প্রত্যেকেই ছিলেন অতিশয় তীক্ষ্ণধী

মানুষ) সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। মনের বন্ধুত্বপূর্ণ মৈত্রী শক্তি উৎপাদন করে। এটা মি. ফোর্ডের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। আপনার জীবনেও ঘটবে যদি সুচিন্তিতভাবে একটি 'মাস্টার মাইন্ড' গ্রুপ গড়ে তুলতে পারেন।

হেনরি ফোর্ড ব্যবসা এবং শিল্প দুনিয়ার সমস্ত খবরাখবর রাখতেন। তিনি বড়বড় মানুষদের সঙ্গে চলাফেরা করতেন এবং এভাবে দারিদ্র, অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করতে সমর্থ হন। এডিসন, বুরব্যাংক, বারোজ এবং ফায়ারস্টোনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে নিজের মস্তিষ্কের শক্তিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন ফোর্ড। এই চারজন মানুষের বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক শক্তি নিজের মস্তিষ্ককে ক্ষুরধার করে তুলতে কাজে লাগিয়েছিলেন ফোর্ড। এছাড়া 'মাস্টার মাইন্ড' প্রিন্সিপালকে কীভাবে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা তো বলাই হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধীর উদাহরণ এ প্রসঙ্গে আবারো টেনে আনা যায়। তিনি বিশ কোটি মানুষকে একই সুতোয় বেঁধে নিতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র ঐকতানের স্পিরিট এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সঙ্গী করে।

গান্ধী আসলে একটি অলৌকিক ঘটনাই ঘটিয়েছিলেন বলা চলে। নইলে কুড়ি কোটি মানুষকে কী করে একই আত্মা এবং দেহে বন্দি করা যায়। এই মানুষগুলো গান্ধীজী যা বলতেন তা-ই শুনত।

শক্তির প্রধান সোর্স, আপনি জানেন **অসীম বুদ্ধিমত্তা** যখন দুটি মানুষ একত্রিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হয়, তারা একটি অবস্থানে নিজেদেরকে দাঁড়া করায় এবং অসীম বুদ্ধিমত্তার গুদামঘর থেকে সরাসরি শক্তি শুষে নেয়। এটি হলো শক্তির সর্বশেষ আধার। এ উৎস থেকেই একজন প্রতিভা বা নেতা বেরিয়ে আসেন।

পড়ুন, ভাবুন এবং পড়ার সময় ধ্যান করুন। শীঘ্রি সেই বিষয়টি আপনার কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়বে, আপনি এর পারসপেক্টিভ বুঝতে পারবেন।

টাকা অর্জন করতে হলে শক্তির প্রয়োজন। এ শক্তির সঙ্গে মেশাতে হবে **বিশ্বাস**। বিশ্বাসের সঙ্গে মিশবে **আকাঙ্ক্ষা**। এর সঙ্গে মিশ্রিত হবে **ধৈর্য** তার সঙ্গে যুক্ত হবে পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে অবশ্যই নামতে হবে **অ্যাকশনে**।

শক্তিকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে এটি কেবল একদিক থেকে প্রবাহিত হয় এবং নদীর ওই দিকে যারা থাকে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে। তার চলা সম্পদের দিকে। এ নদীর অপর দিকটি বিপরীত দিকে প্রবাহমান। বিপরীত দিকে থাকে ভাগ্যহতরা, তারা যায় দারিদ্র্য এবং দুঃখের দিকে।

যারা ধনী হয়েছেন তাঁর প্রত্যেকেই জীবন নদীর এ অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে চিন্তার প্রক্রিয়া। চিন্তার ইতিবাচক আবেগগুলো নদীর সেই দিকটি তৈরি করে যেটি নদীকে সম্পদের দিকে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে। নেতিবাচক আবেগ নদীর আরেক যে দিকটি তৈরি করে তা দারিদ্রের দিকে ধাবিত হয়।

কিছু লোক অবশ্য নদীস্রোতের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকেই পাল্টাপাল্টিভাবে থাকার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কখনো থাকে পজিটিভ সাইডে, কখনোবা নেগেটিভ সাইডে। ১৯২৯ সালের ওয়াল স্ট্রিট ক্র্যাশ লক্ষ লক্ষ মানুষকে নদীর পজিটিভ দিক থেকে নেগেটিভ দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এই লাখ লাখ মানুষ সংগ্রাম করেছে, এদের মধ্যে কেউ কেউ হতাশা এবং ভয়ে নদীর পজিটিভ সাইডে যেতে চেয়েছে।

দারিদ্র এবং সমৃদ্ধি প্রায়ই জায়গা বদল করে। ওই ক্রাশটি পৃথিবীকে এ সত্যটি শিখিয়েছে যদিও পৃথিবী এর কথা বেশিদিন মনে রাখবে না। দারিদ্র্যের জন্য কোনো প্ল্যান করতে হয় না। এ নির্দয়, নিষ্ঠুর। এ নিজে এসেই হামলে পড়ে। কিন্তু সমৃদ্ধি লাজুক ও ভীরু। একে আকর্ষণ করতে হয়। **সবাই সম্পদ চায় তবে খুব কম মানুষই জানে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা** এবং **তীব্র আকাঙ্ক্ষাই পারে কামনার সমৃদ্ধি এনে দিতে।**

চৌদ্দ

সেক্স ট্রান্সমিউটেশনের রহস্য

ধনী হওয়ার দশম পদক্ষেপ

'ট্রান্সমিউটেশন' কথাটির অর্থ হলো কোনো কিছুর পরিবর্তন করা অথবা এনার্জির কোনো আকার বা গঠনের উপাদান অন্য কিছুতে স্থানান্তর করা।

সেক্সের আবেগ-অনুভূতি কিন্তু মনেরই আরেকটি দিক। সেক্স ট্রান্সমিউটেশন একটি সহজ এবং সহজে ব্যাখ্যাযোগ্য বিষয়।

মানুষের মাঝে যত রকমের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো যৌন আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ কল্পনা করে, সাহসী হয়, তাদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি এবং ধৈর্যের সৃষ্টি হয়। যৌন আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি খুবই প্রাকৃতিক। এ আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে রাখা উচিত নয়। একে প্রকাশ করার জন্য একটি আউটলেট দেয়া দরকার যা সমৃদ্ধ করে তুলবে শরীর, মন এবং স্পিরিট। ট্রান্সমিউটেশনের মাধ্যমে এ আউটলেট সৃষ্টি না করলে এটি ফিজিকাল চ্যানেলের মাধ্যমে আউটলেট খুঁজে নেবে।

নদীতে বাঁধ দিয়ে কিছু সময়ের জন্য পানি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে সে পানি অবশেষে এটি আউটলেট তৈরি করে বেরিয়ে পড়ে। সেক্সের ইমোশন বা আবেগের বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। একে কিছু সময়ের জন্য অবদমিত এবং নিয়ন্ত্রিত রাখা যায় তবে প্রাকৃতিক কারণেই সে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইবে। যদি তাকে কোনো সৃজনশীল প্রচেষ্টার মাঝে স্থানান্তর বা পরিবর্তন করা না হয় সে নিজেই কোনো আউটলেট খুঁজে নেবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো পাওয়া গেছে তা হলো

১. যারা বিশাল বিশাল অর্জন করেছেন তারা সেক্স নেচারে অত্যন্ত ডেভেলপড ছিলেন: তারা সেক্স মিউটেশন শিল্পটিকে শিখে নিয়েছিলেন।

২. যে সব মানুষ সাহিত্য, কলা, শিল্প, স্থাপত্যসহ অন্যান্য পেশায় খ্যাতি লাভ

করেছেন, তাদেরকে নারীগণ অনুপ্রাণিত করেছেন।

এ চমৎকার আবিষ্কারটির গবেষণাটি করা হয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে। দেখা যায় দুই হাজার বছর আগে থেকেই নারী এবং পুরুষ মিলে দারুণ যা কিছু সংঘটিত করেছেন তাতে তাদের যৌন প্রবৃত্তি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

যৌনতার আবেগ এক 'অদম্য শক্তি'। এ শক্তিতে চালিত পুরুষ অ্যাকশনের জন্য অতি মানবীয় শক্তি যেন অর্জন করে। সেক্স ট্রান্সমিউটেশন একজনকে প্রতিভাদীপ্ত করে তুলতে পারে।

সেক্সের আবেগে থাকে সৃজনশীল দক্ষতার গোপন মন্ত্র। মানুষ অথবা জানোয়ার, যারই সেক্স গ্ল্যান্ড আপনি নষ্ট করে দিন দেখবেন তার অ্যাকশনের প্রধান উৎসই গেছে ধ্বংস হয়ে। জানোয়ারদের খাসি করার পরে কী ঘটে? একটা ষাঁড়কে যখন খাসি করা হয় তখন সে একটা গাভীর মতোই দুর্বল হয়ে পড়ে। সেক্স অলটারেশন বা যৌনাঙ্গের পরিবর্তন নারী-পুরুষ উভয়কেই দুর্বল করে ফেলে।

দশটি মানসিক উদ্দীপক

মানুষের মন যে দশটি উদ্দীপককে খুব সহজে সাড়া দেয় সেগুলো হলো

১. যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ব্যাকুলতা।

২. প্রেম।

৩. খ্যাতি, ক্ষমতা এবং অর্থের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

৪. সেম সেক্স অথবা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

৫. ঐকতানের বন্ধনে গ্রন্থিত মাস্টার মাইন্ড মৈত্রী।

৬. মিউচুয়াল সাফারিং বা একই রকম দুঃখ কষ্টের শিকার যারা হয়।

৭. অটো-সাজেশন।

৮. সঙ্গীত।

৯. ভয়।

১০. মাদক এবং মদ।

উদ্দীপকের তালিকায় যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ব্যাকুলতা শীর্ষে রাখা উচিত যা মনের কম্পনের 'সেটআপ' তৈরিতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এই উদ্দীপকের আটটিই প্রাকৃতিক এবং গঠনমূলক। দুটি অবশ্য ধ্বংসাত্মক। এ তালিকাটি করা হলো যাতে আপনি মনের উত্তেজনা সৃষ্টির প্রধান উৎসগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এ নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। এ বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে পারবেন সকল উদ্দীপকের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং প্রবল হলো সেক্স। আর সেক্স এনার্জির ট্রান্সমিউটেশন একজন জিনিয়াস তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

জিনিয়াস তৈরি হয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারা

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হলো 'সৃজনশীল কল্পনা।' এই ক্ষমতা বা শক্তিটি বেশিরভাগ মানুষই সারাজীবনে একটিবারও ব্যবহার করে না। আর করলেও সেটা ঘটনাক্রমে। অতি অল্পসংখ্যক মানুষ জেনে বুঝে সৃজনশীল কল্পনার আশ্রয় নেয়। যারা এ কাজটি স্বেচ্ছায় করে এবং তার কাজগুলো বুঝতে পারে তারাই জিনিয়াস।

সৃজনশীল কল্পনা মানুষের সসীম মন এবং অসীম বুদ্ধিমত্তার মাঝে সরাসরি একটি লিংক বা সংযোগ স্থাপন করে। এ পর্যন্ত যত বিপ্লব ঘটেছে, নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে সবকিছুই সম্ভব হয়েছে সৃষ্টিশীল কল্পনার সাহায্যে।

যখন মানুষের মনে কোনো আইডিয়া ঝিলিক দেয় যাকে ইংরেজিতে বলে 'Hunch' তা আসে নিচের সোর্সগুলো থেকে:

১. অসীম বুদ্ধিমত্তা

২. অবচেতন মন যেখানে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের ছাপ এবং চিন্তার আবেগ রক্ষিত থাকে যা মস্তিষ্ক থেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনোটিতে পৌঁছায় না।

৩. অন্য কোনো লোকের মন থেকে সদ্য প্রকাশিত চিন্তা-ভাবনা অথবা কোনো ছবি।

৪. অন্য কারো অবচেতন মনের গুদামঘর।

পুরুষরা কেন কদাচিৎ চল্লিশের আগে সফল হয়

আমি যে ২৫,০০০ মানুষকে বিশ্লেষণ করেছি তাতে লক্ষ্য করেছি চল্লিশে পা দেয়ার আগে তাঁরা তাঁদের আসল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেননি। এ বিষয়টি আমাকে এতটাই কৌতূহলী করে তোলে যে আমি এর কারণগুলো সাবধানে খুঁজতে থাকি এবং কুড়ি বছরেরও বেশি সময় কাটিয়ে দিই এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে।

আমার গবেষণায় একটি বিষয় উঠে আসে যে যারা চল্লিশ বা পঞ্চাশের আগে সাফল্যের চেহারা দেখতে পারেননি তারা তাঁদের শক্তি শারীরিক সেক্সের পেছনেই বেশি অপচয় করেছেন। তবে যারা এ অপচয়টি কম করেছেন তারা সফলও হয়েছে অন্যদের চেয়ে আগে।

আমেরিকার এক খ্যাতনামা ব্যবসায়ী আমার কাছে অকপটে স্বীকার করেন যে তিনি যত পরিকল্পনা তৈরি করেছেন তার পেছনে অবদান ছিল তাঁর সুন্দরী সেক্রেটারিটির। এই সেক্রেটারির উপস্থিতি তাঁকে সৃষ্টিশীল কল্পনার শীর্ষে নিয়ে যেত যা তিনি অন্য কোনো উদ্দীপক থেকে পেতেন না।

আমেরিকার আরেক অত্যন্ত সফল মানুষ তাঁর সফলতার জন্য ঋণ স্বীকার করেছেন এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণীর প্রতি যে মেয়েটি বারো বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই মানুষটির অনুপ্রেরণার উৎস ছিল।

অনেক বিখ্যাত লেখক মদ এবং মাদকের মতো কৃত্রিম স্টিমুল্যান্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিখ্যাত সব লেখা লিখেছেন। যেমন **এডগার অ্যালান পো** তাঁর বিখ্যাত কবিতা **'র‍্যাভেন'** লিখেছিলেন মদে চুর হয়ে থেকে। জেমস হুইটকক্স রাইলিও তাঁর জীবনের সেরা রচনাগুলো রচনা করেছেন মদ পান করে। রবার্ট বার্নসও তাই। কিন্তু এ কথাটি ভুলে গেলে চলবে না শেষ পর্যন্ত মদের নেশাই তাঁদের জীবনাবসান করেছিল।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের সমস্ত আবেগ-অনুভূতির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো সেক্স। মানসিক আরো উদ্দীপক থাকলেও তাদের কেউই এমনকী সম্মিলিতভাবেও সেক্সের চালিকা শক্তির সমান নয়।

মাইন্ড স্টিমুলেশন বা মানসিক উদ্দীপক সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে চিন্তার কম্পন বৃদ্ধি করতে পারে। যে দশটি উদ্দীপকের কথা বলা হলো তা সবচেয়ে কমন উদ্দীপক বলে অভিহিত।

এই সোর্সগুলোর সাহায্যে যে কেউ অবচেতন মনের গুদাম ঘরের অসীম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে ভাব বিনিময় করতে পারে।

একজন শিক্ষক ৩০,০০০ সেলসম্যানকে প্রশিক্ষিত করেছেন। তিনি একটি দারুণ আবিষ্কার করেছেন। আর তা হলো যারা সেক্স খুব উপভোগ করে তারা সেলসম্যান হিসেবে খুব দক্ষ হয়। তাদের মধ্যে যেন চৌম্বকীয় শক্তি থাকে। এই এনার্জি বা শক্তি যেভাবে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় তা হলো

১. হ্যান্ডশেক। হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অপরের মধ্যে শক্তিটি প্রবেশ করিয়ে দেয়া যায়।

২. গলার স্বর। গলার স্বর যদি চমৎকার ভরাট কিংবা সুরেলা হয় তা-ও আকর্ষকের কাজ করে।

৩. শরীরী অঙ্গভঙ্গি। সেক্স জীবনে সুখী সেলসম্যানদের নড়াচড়ায় থাকে স্বত:স্ফূর্ততা এবং সহজবোধ্যতা।

৪. চিন্তার কম্পন। হাইলি সেক্সড মানুষ তাদের চিন্তার মাঝে সহজেই সেক্সের আবেগ মিশ্রিত করতে পারে এবং আশপাশের লোকজন তাদের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়।

৫. বেশভূষা। হাইলি সেক্সড সেলসম্যানরা তাদের বেশভূষার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকে। তারা এমন সব পোশাক পরে যাতে তাদের ব্যক্তিত্ব, শারীরিক গঠন, গায়ের রঙ ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে।

সেলসম্যান নিয়োগের সময় দক্ষ সেলস ম্যানেজার লক্ষ্য করেন লোকটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যক্তিগত মাধুর্য এবং আকর্ষণ রয়েছে কিনা। যে মানুষের সেক্স এনার্জির অভাব রয়েছে তার ভেতরে সব সময়ই উৎসাহের অভাব থাকে এবং সে অপরকে উৎসাহিত করতেও পারে না। অথচ সেলসম্যানশিপে এই উৎসাহের বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি বিষয় সে সেলসম্যানটি যাই বিক্রি করুক না কেন।

পাবলিক স্পিকার, বাগ্মী, প্রিচার, লইয়ার কিংবা সেলসম্যান যারই সেক্স এনার্জির অভাব রয়েছে সেই 'ফ্লপ' বলে বিবেচিত হয়। একজন সেলসম্যানের সেক্স অ্যাপিল দ্বারা মহিলা ক্রেতারা বেশিরভাগ সময় আকৃষ্ট হয়। কাজেই

সেলসম্যানের দক্ষতার সঙ্গে সেক্স এনার্জি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে আছে। মাস্টার সেলসম্যানরা পণ্য বিক্রয়ে অত্যন্ত দক্ষ কারণ, তারা চেতন বা অবচেতনভাবে বিক্রির উৎসাহের মাধ্যমে সেক্স এনার্জি ট্রান্সমিউট করে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ এই হীনমন্যতায় ভোগে যে খুব বেশি মাত্রায় সেক্সি হওয়া একটা অভিশাপ। সেক্স তখনই একটি গুণে পরিণত হয় যখন একে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। তবে একটা কথা কখনো ভুলে যাবেন না যে অসংযমী সেক্স খুবই খারাপ ব্যাপার। এটি অতিরিক্ত মদ্যপান এবং অপরিমিত আহার গ্রহণের মতোই নিন্দনীয়।

মদ পান এবং মাদক গ্রহণ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ধ্বংস করে দেয়, মস্তিষ্কসহ। ঠিক তেমনি অতিরিক্ত সেক্সও আপনার জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

একজন সেক্স পাগল লোক মাদক পাগল লোকের সঙ্গে তুলনীয়। দু'জনেই তাদের ইচছা শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। অতিরিক্ত সেক্স করলে শুধু যে উইল পাওয়ারের ক্ষতি হয় তা নয় এটি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে একজন মানুষকে পাগলও বানিয়ে দিতে পারে। হাইপোকনড্রিয়া (কাল্পনিক অসুস্থতা) অসুখটি কিন্তু সৃষ্টি হয় যথেচ্ছ যৌনাচার থেকেই।

সেক্স নিয়ে অজ্ঞতার কারণ এটিকে প্রায় সকলেই রহস্যময় বিষয় বলে মনে করে এ নিয়ে মুখ খুলতেও চায় না। এটি তরুণদেরকে তাই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

লেখাটির শিরোনাম ছিল চল্লিশের আগে পুরুষরা কেন কদাচিৎ সফল হয়। অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায় যারা চল্লিশের পরে কিংবা পঞ্চাশে পৌঁছে সাফল্যের মুখ দর্শন করেছেন।

হেনরি ফোর্ড চল্লিশের আগে ব্যবসায় সফল হতে পারেননি। এন্ড্রু কার্নেগি চল্লিশের পরে তাঁর পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলতে শুরু করেন।

আমেরিকান শিল্পপতি এবং ফিন্যান্সিয়ারদের আত্মজীবনী পড়লে দেখা যায় তাদের সবচেয়ে উৎপাদনশীল সময় ছিল চল্লিশ থেকে ষাট বছর। ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যমর্তী সময়ে লোকে শিখতে শুরু করে (অবশ্য অনেকে কিছুই শেখে না।) সেক্স ট্রান্সমিউশনের আর্ট এটি অনেকে আবার অবচেতনভাবেই আবিষ্কার করে ফেলে। তারা দেখে তাদের অ্যাচিভমেন্ট পাওয়ার বা অর্জনের

শক্তি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বেশিরভাগ সময় তারা এ পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। প্রকৃতিই প্রতিটি মানুষের পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মাঝে প্রেম এবং যৌনতার একটি ঐকতান গড়ে তুলতে শুরু করে যাতে সে এই বিপুল শক্তিগুলোকে উদ্দীপক হিসেবে কাজে লাগাতে পারে।

সেক্স একাই একশো তবে এর শক্তিগুলো যেন সাইক্লোনের মতো, মাঝে মাঝে নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যখন প্রেমের আবেগ মিশে যায় যৌনতার আবেগের সঙ্গে, ফলাফল নিয়ে আসে উদ্দেশ্যের স্থিরতা, ভারসাম্য, বিচারের নির্ভুলতা এবং ব্যালান্স।

যখন স্রেফ যৌনতার কারণে একজন পুরুষ একজন নারীর কাছে যায় তার কাজগুলো হয়ে উঠতে পারে ধ্বংসাত্মক। একজন নারীকে খুশি করার জন্য, তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মতলবে একজন পুরুষ চুরি করতে পারে, প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে, এমনকী হত্যা করতেও তার হাত কাঁপে না। কিন্তু যখন এর সঙ্গে প্রেম ও ভালবাসার আবেগ যুক্ত হয় ওই একই মানুষ তার কাজগুলো করে সুস্থ মস্তিষ্কে, ভারসাম্য রেখে এবং যুক্তিযুক্তভাবে।

অপরাধবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন কঠোরতম একজন অপরাধীকেও সঠিক পথে নিয়ে আসা যায় রমনীর প্রেম দিয়ে। এ পরিবর্তনটা আসে হৃদয় থেকে, মস্তিষ্ক থেকে নয়।

রিফরমেশন এর মানে 'হৃদয় বা অন্তরের পরিবর্তন, 'মস্তিষ্কের পরিবর্তন' নয়। প্রেম, ভালোবাসা, সেক্স ইত্যাদি আবেগগুলো পুরুষকে সর্বোচ্চ অর্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রেম হলো এমন এক আবেগ যা সেফটি ভাল্বের মতো কাজ করে। নিশ্চিত করে ব্যালান্স, ভারসাম্য এবং গঠনমূলক প্রচেষ্টাসমূহ। যখন এ তিনটি আবেগ একত্রিত হয় তখন তা একজন জিনিয়াসকে শিখরে তুলে দিতে পারে।

ইমোশন বা আবেগ হলো মনের একটি অবস্থা। প্রকৃতি মানুষকে 'মনের রসায়ন' দিয়েছে যা রসায়নের মতোই একইভাবে কাজ করে। একজন রসায়ন-বিদ রসায়নের সাহায্যে কিছু উপাদান মিশিয়ে ভয়ংকর বিষ তৈরি করতে পারেন। তেমনি মনের মধ্যে যখন সেক্স এবং হিংসা মিশ্রিত হয় তখন তা একজন মানুষকে উন্মত্ত জানোয়ারে পরিণত করতে পারে।

মানুষের মনে যে ধ্বংসাত্মক আবেগগুলো রয়েছে তা এমন বিষ তৈরি করতে

সক্ষম যা মনের ন্যায়বিচার ও সুষ্ঠু চিন্তাভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়।

একজন মানুষের মনের সুখানুভূতিগুলোকে আমাদের উৎসাহিত করা উচিত আর কুআবেগের উপস্থিতি নিরুৎসাহিত করা উচিত। মন হলো অভ্যাসের স্থান। একে যা খাওয়ানো হয় তা-ই খেয়ে বাঁচে। ইচ্ছাশক্তির বলে যে কেউ যে কোনো আবেগের উপস্থিতিকে নিরুৎসাহিত করতে পারে এবং অপর উপস্থিতিকে উৎসাহিত করতে পারে। ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন কিছু নয়। নিয়ন্ত্রণ আসে ধৈর্য এবং অভ্যাস থেকে। নিয়ন্ত্রণের সিক্রেট লুকিয়ে থাকে ট্রান্সমিউটেশনের প্রক্রিয়ার মাঝে। যখন কোনো মানুষের মনে নেতিবাচক আবেগ প্রবেশ করে তখন একে ইতিবাচক কিংবা গঠনমূলক আবেগে ট্রান্সমিউট বা রূপান্তর করা যায়।

প্রেম এবং যৌনতার আবেগ পরিষ্কার ছাপ ফেলে যায়। এ চিহ্নগুলো এতটাই দৃশ্যমান যে কেউ ইচ্ছে করলেই তা পাঠ করতে পারবে। যে লোক প্যাশন বা যৌনাবেগ দ্বারা তাড়িত, যার ভেতরে শুধু সেক্সের চিন্তা কাজ করে, তাকে দেখেই কিন্তু বোঝা যায়। তার চোখ এবং মুখের রেখা তার সমস্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ করে দেয়। তবে এ আবেগের সঙ্গে যখন যুক্ত হয় প্রেম তখন তার মুখভাব নরম ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

প্রেমের আবেগ মানুষের শৈল্পিক এবং নৈসর্গিক প্রকৃতিকে পরিস্ফুটিত করে তোলে। এটি একজন মানুষের আত্মার ওপর ছাপ ফেলে, এমনকী সময়ের সঙ্গে আগুন নিভে গেলেও সেই ছাপ মোচন হয় না।

প্রেমের স্মৃতি মন থেকে কখনো মুছে যায় না। উদ্দীপনার সোর্স ম্লান হয়ে যেতে পারে কিন্তু তারা ঠিকই মনের মাঝে থেকে যায়। যারা প্রকৃত ভালোবাসতে জানে তারা এ ভালোবাসার কথা কদাপি ভুলতে পারবে না। প্রেমের প্রভাব থেকেই যায় কারণ প্রকৃতির মাঝেই উজ্জীবিত প্রেম। যে লোক প্রেম-ভালোবাসা পেয়েও উজ্জীবিত হয় না সে দুর্ভাগা ছাড়া আর কী? সে বেঁচে থেকেও মৃত।

আপনি অতীত প্রেমের সুখস্মৃতি রোমন্থন করুন। বর্তমানের অনেক দুশ্চিন্তাই তাতে দূর হয়ে যাবে। এ স্মৃতিচারণ আপনাকে সাময়িকভাবে হলেও জীবনের কঠিন বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। হয়তো এ স্মৃতিচারণই এক সময় আপনার সামনের দিনগুলো আমূল বদলে দেবে, কে বলতে পারে?

আপনি প্রেম করেও তা হারিয়েছেন সে জন্য যদি নিজেকে দুর্ভাগা মনে হয়, এক্ষুনি চিন্তাটা সরিয়ে ফেলুন মন থেকে। যে একবার প্রকৃত ভালোবাসতে পারে

সে কখনো হারে না, সে দুর্ভাগা নয়। প্রেম-ভালোবাসা তো খেয়ালি এবং ক্ষণস্থায়ী। কখনো রোদ কখনো বৃষ্টির মতো। হঠাৎ করেই আসে এবং কিছু না বলেই বিদায় হয়ে যায়। যখন প্রেম জীবনে আসবে তাকে উপভোগ করুন তবে চলে গেলে তা নিয়ে মন খারপাপ করবেন না। দুশ্চিন্তা কোনোকিছু ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

প্রেম একবার এসেছিল জীবনে আর কখনো আসবে না—এ চিন্তাটাই মনে স্থান দেবেন না। প্রেম আসে যায় তবে দুটো প্রেমের অভিজ্ঞতা কখনোই এক রকমের হয় না এবং তা একইভাবে মানুষকে প্রভাবিতও করে না। কোনো একটি প্রেমের অভিজ্ঞতা হয়তো গভীরভাবে দাগ কেটে যায় মনে। তবে সকল অভিজ্ঞতার একটি মূল্য রয়েছে। এটি অনেকের উপকারও করে। শুধু উপকার করে না সেইসব মানুষকে যারা প্রেমে ছ্যাঁকা খেয়ে সারাক্ষণ 'হায় হায়' করতে থাকে।

প্রেম নিয়ে হতাশায় ভুগবার কোনো মানে নেই। লোকে যদি প্রেম এবং যৌনতার আবেগের মাঝখানের পার্থক্যটি বুঝতে পারত তাহলে হতাশায় ভুগত না। প্রধান পার্থক্য হলো প্রেম হলো, স্বর্গীয় যাকে ছোঁয়া যায় না আর সেক্স হলো শারীরিক, যাকে স্পর্শ করা যায়। যে কোনো অভিজ্ঞতা তা যদি আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে তা ক্ষতিকর হয় না যদি না সেটি অজ্ঞতাবশত এবং হিংসার বশে করা হয়।

প্রেম, সন্দেহাতীতভাবেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতা। এটি অসীম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে বিনিময় করে। যখন রোমান্স এবং সেক্সের আবেগের সঙ্গে এর মিশ্রণ ঘটে, এটি সৃজনশীল প্রচেষ্টার মইয়ের ধাপে আরোহন করতে পারে।

প্রেম এমন এক আবেগ যার রয়েছে নানান আকার, শেড এবং রঙ। বাবা-মা তার সন্তানদের জন্য যেরকম স্নেহ বা ভালোবাসা অনুভব করেন, একজন প্রেমিকের তার প্রেমিকার প্রতি ভালোবাসা আবার ভিন্নরকমের। দ্বিতীয় আবেগটির মধ্যে যৌনতার আবেগ লুকিয়ে থাকে, প্রথমটিতে তা নয়।

তবে প্রকৃত বন্ধুত্বের মধ্যে যে ভালোবাসার বিষয়টি থাকে তা আবার অন্যগুলো থেকে আলাদা।

বিয়েতে প্রেম তথা সুখ যেমন এনে দিতে পারে না তেমনি সেক্সের পক্ষেও তা একাকী করা সম্ভব নয়। যখন দুটি আবেগ একত্রিত হয় তখন বিবাহিত জীবন

সুখের হয়ে ওঠে। সেই স্বামীই সৌভাগ্যবান যার স্ত্রী লাভ, সেক্স এবং রোমান্সের মধ্যকার প্রকৃত সম্পর্ককে বুঝতে পারে।

একটি পুরানো প্রবাদ আছে। 'সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে'। একজন নারী সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারে আবার তার কারণেই সংসারে অশান্তির আগুন দাউদাউ জ্বলতে পারে। একজন স্ত্রী যদি প্রেম, যৌনতা এবং রোমান্সের অর্থ বুঝতে পারে তবে তার সংসার সুখের হয়ে ওঠে। আর বুঝতে অপারগ হলে বিপরীত ঘটনাটিই ঘটে।

পুরুষ প্রকৃতগতভাবেই বহুগামী হয়ে থাকেন। এটার জন্য দায়ী তাদের বায়োলজিকাল ইনহেরিট্যান্স। তবে এ কথা সত্য যে একজন স্বামীর ওপর একজন স্ত্রীই সবচেয়ে বড় প্রভাব রাখতে পারে। একজন স্ত্রী যখন নিজের ওপর তার স্বামীর আগ্রহ হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থার সৃষ্টি করে এবং স্বামীটি পরনারীর প্রতি আসক্ত হতে থাকে, এ ঘটনা ঘটে স্ত্রীর অজ্ঞতার কারণে এবং সেক্স, প্রেম ও রোমান্সের প্রতি তার উদাসীনতার জন্য। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত প্রেম থাকলে অবশ্য এরকমটি ঘটার সম্ভাবনা নেই।

একই ব্যাপার স্বামীর ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে যদি নিজের প্রতি তার স্ত্রীর আগ্রহ হারিয়ে ফেলার মতো পরিস্থিতি সে তৈরি করে। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুঁটিনাটি অনেক বিষয় নিয়েই ঝগড়া হয়। নিখুঁত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মূল কারণ প্রেম, যৌনতা ও রোমান্সের প্রতি তাদের ঔদাসীন্য কিংবা অজ্ঞতা। পুরুষ চায় নারীকে মুগ্ধ করতে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এ সংস্কৃতি চলে আসছে। পুরুষ যখন থেকেই নারীর চোখে শ্রেষ্ঠ হতে চেয়েছে। নারীদেরকে পুরুষের জীবন থেকে সরিয়ে ফেলুন দেখবেন ধন-সম্পদ ঐশ্বর্য সবকিছুই তার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে। পুরুষ ঐশ্বর্য, খ্যাতি, ক্ষমতা ইত্যাদি অর্জনই করে নারীকে খুশি করার আকাঙ্ক্ষা থেকে।

যে নারী পুরুষের প্রকৃতি বুঝতে পারে এবং সুকৌশলে তাকে চালিত করতে পারে তাকে কখনো অপর নারীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ভয়ে থাকতে হয় না। প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে পুরুষ দানবীয় ভূমিকায় অন্য পুরুষের সামনে আবির্ভূত হতে পারে কিন্তু এই দানবকেই একজন নারী প্রেম ভালোবাসা এবং সেক্স দিয়ে সহজে বশীভূত করতে পারে।

বেশিরভাগ পুরুষই অবশ্য স্বীকার করতে চাইবে না যে তারা নারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয় কারণ, পুরুষের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে সে শক্তিশালী মানব হিসেবে

স্বীকৃতি পেতে চায়। তবে বুদ্ধিমান নারীরা এ ব্যাপারটি সহজেই বুঝতে পারে এবং এ নিয়ে তারা ঘাঁটাঘাঁটি করতেও যায় না। কিছু পুরুষ জানে তারা তাদের কন্যা-জায়া-জননী দ্বারা প্রভাবিত তবে সুকৌশলে তারা বিষয়টি নিয়ে কথা বাড়ায় না কারণ তাদের ঘটে এটুকু বুদ্ধি অন্তত: আছে **যে কোনো পুরুষই সঠিক নারীটির সংযত প্রভাব ছাড়া সুখী কিংবা সম্পূর্ণ নয়**। যে পুরুষ এই সত্যটি স্বীকার করে না সে সেই শক্তি থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখে যে শক্তি অন্য যেকোনো শক্তির চেয়ে একত্রিতভাবে পুরুষকে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

পনেরো

অবচেতন মন

সংযোগ স্থাপনের লিংক

ধনী হওয়ার একাদশ পদক্ষেপ

অবচেতন মন গড়ে উঠেছে কিছু সচেতনতা নিয়ে যেখানে চিন্তা শক্তির প্রতিটি আবেগ-অনুভূতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যেকোনো একটির সাহায্যে অবজেকটিভ মাইন্ডে পৌঁছে যায়, সেখানে ক্ল্যাসিফায়েড এবং রেকর্ড হয় এবং যেখান থেকে চিন্তা-ভাবনা যেকোনো সময় স্মরণ করা সম্ভব অথবা বের করে আনা যায়, যেভাবে লোকে ফাইল কেবিনেট থেকে চিঠিপত্র বের করে সেভাবে।

অবচেতন মন প্রকৃতি এবং ধরন অনুযায়ী চিন্তা-ভাবনাগুলো রিসিভ করে, ফাইল করে, ইমপ্রেশনগুলো চিহ্নিত করে। আপনি আপনার অবচেতন মনে যে কোনো পরিকল্পনা, চিন্তা কিংবা উদ্দেশ্য প্রবেশ করাতে পারেন যেগুলো দিয়ে আপনি অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা করছেন।

দিন-রাত কাজ করে অবচেতন মন

একটি বিশেষ কোনো উপায়ে যা মানুষ ঠিক জানে না, অবচেতন মন অসীম বুদ্ধিমত্তার শক্তিকে টেনে নেয় সেই শক্তির জন্য যার সাহায্যে একজন মানুষের আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপ দিতে পারবে।

অবচেতন মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আপনার নেই তবে এর কাছে আপনি যে কোনো পরিকল্পনা কিংবা উদ্দেশ্য তুলে দিতে পারবেন যেগুলোর একটি নিরেট কাঠামোর রূপান্তর আশা করছেন। অটো-সাজেশনের অধ্যায়ে বলা হয়েছে কীভাবে অবচেতন মনকে ব্যবহার করবেন। ওই অধ্যায়টি পড়ুন।

এরকম ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে যে অবচেতন মন মানুষের অসীম এবং সসীম বুদ্ধিমত্তার মাঝে লিংক বা যোগাযোগের কাজ করে।

আপনি যখন অবচেতন মনের অস্তিত্ব বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেবেন এবং এর সম্ভাবনা বুঝতে পারবেন যে এটি আপনার আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপ ঘটাতে মিডিয়াম হিসেবে কাজ করতে পারে, তখন আকাঙ্ক্ষার অধ্যায়ে যেসব নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে তার পূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনি এও বুঝতে পারবেন আপনাকে কেন বারবার হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। **আপনি আসলে কী চাইছেন সেই আকাঙ্ক্ষাগুলো পরিষ্কার করুন এবং তা লিখে নিন।**

যে তেরোটি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে এ বইতে তা আসলে উদ্দীপক, আপনি এগুলোর সাহায্যে অবচেতন মনের কাছে পৌঁছাতে পারবেন এবং তাকে প্রভাবিতও করতে পারবেন। মনে রাখবেন অবচেতন মন শুধুমাত্র অভ্যাসের কারণে স্বেচ্ছায় পরিচালিত হতে পারে এবং এ বিষয়ে **বিশ্বাস** অধ্যায়ে কিছু নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে। ধৈর্য ধরুন। লেগে থাকুন।

বিশ্বাস এবং অটো-সাজেশন নিয়ে যা লেখা হয়েছে তার অনেক কিছুই এখানে পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে আপনার অবচেতন মনের উপকারার্থে। স্মরণে রাখবেন আপনার অবচেতন মন কাজ করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে, সেখানে আপনি প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করুন বা না-ই করুন তাতে অবচেতন মনের কিছু এসে যায় না। আপনি যদি ভয়, দারিদ্র্যসহ সব রকম নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন তবে তা নেতিবাচক মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে। কাজেই এসব চিন্তা মনে স্থান দেবেন না।

অবচেতন মন অলস বসে থাকে না। আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষা অবচেতন মনে প্রবেশ করাতে ব্যর্থ হলেও এটি ঠিকই তার মনে চিন্তাগুলো ঢোকাবে। আমরা আগেই বলেছি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় চিন্তাই অবচেতন মনে ক্রমাগত প্রবেশ করতে থাকে সেই চারটি সূত্র থেকে যেগুলোর কথা সেক্স ট্রান্সমিউটেশন এর অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি যে জীবন যাপন করছেন, আপনি যা ভাবছেন, হোক তা পজেটিভ কিংবা নেগেটিভ, আপনি কিন্তু জানতেও পারছেন না ওগুলো আপনার অবচেতন মনে ঢুকে যাচ্ছে। তবে আপনি যদি নেতিবাচক চিন্তা মনে ঢোকাতে না চান তাহলে নেগেটিভ ইম্পালসের ফ্লো বা প্রবাহ বন্ধ করে দিন এবং আকাঙ্ক্ষার পজেটিভ ইম্পালসগুলো প্রবেশ করান।

আপনি যখন এটি অর্জন করতে পারবেন আপনার অবচেতন মনের দুয়ারের চাবি খুলে যাবে। তাছাড়া আপনি ওই দুয়ারটি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে

পারবেন এভাবে যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত চিন্তাভাবনা আপনার অবচেতন মনকে প্রভাবিত করতে পারবে না।

মানুষ যা-ই সৃষ্টি করে তার শুরুটা কিন্তু হয় চিন্তার আবেগ থেকে। আগে চিন্তা না করে কোনো কিছুই মানুষের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব না। কল্পনা শক্তির সাহায্যে চিন্তার আবেগ দিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা যায়। এই কল্পনা যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে একে দিয়ে পরিকল্পনা তৈরির কাজে লাগানো যায়।

সকল চিন্তার আবেগই স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে আশ্রয় নেয় অবচেতন মনের মাঝে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কল্পনাশক্তি এবং বিশ্বাস। বিশ্বাস করে কোনো পরিকল্পনা করলে বা উদ্দেশ্য থাকলে তা অবচেতন মনের কাছে পেশ করা যায়। আর এসব কিছুই করা সম্ভব কল্পনার সাহায্যে।

ইলা হুইলার উইলকক্স অবচেতন মনের শক্তিকে উপলব্ধি করার পরে একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতাটি নিম্নরূপ:

You never can tell what a thought will do
In bringing you hate or love
the thoughts are things, and their airy wings
Are swifter than carrier doves.
they follow the law of the universe
Each thing creates its kind,
And they speed o'er the track to bring you back
Whatever went out from you mind

মিসেস উইলকক্স সত্যটি বুঝতে পেরেছিলেন যে চিন্তাশক্তিগুলো একজন মানুষের মন থেকে বেরিয়ে যায় তা অপর কারো অবচেতন মনের গভীরে প্রবেশ করে যেখানে তারা চুম্বক, প্যাটার্ন কিংবা ব্লুপ্রিন্ট হিসেবে কাজ করে। যার দ্বারা প্রভাবিত হয় অবচেতন মন এবং ওই চিন্তাগুলোকে মূর্ত রূপ দিতে সাহায্য করে।

এটা সবাই জানে যে আবেগ বা অনুভূতি দ্বারা বেশিরভাগ মানুষই শাসিত হয় বা পরিচালিত হয়।

সাতটি ইতিবাচক আবেগ রয়েছে, সাতটি নেতিবাচক আবেগ রয়েছে। নেতিবাচক অনুভূতিগুলো স্বেচ্ছায় চিন্তার আবেগের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ওখান থেকে চলে যায় অবচেতন মনে। অটো-সাজেশন ব্যবহার করে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা

মনের মধ্যে ঢোকাতে হবে।

আপনি আপনার অবচেতন মনের 'অভ্যন্তরীণ দর্শক'দের প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করার প্রস্তুতি নেবেন যাতে অর্থের জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা এর কাছে তুলে দিতে পারেন। 'অভ্যন্তরীণ দর্শকদের সঙ্গে তাদের ভাষায় আপনাকে কথা বলতে হবে নতুবা তারা আপনার আহ্বানে সাড়া দেবে না। এটি আবেগ এবং অনুভূতির ভাষা সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে। এখানে সাতটি ইতিবাচক প্রধান আবেগের কথা বলা হলো, সাতটি প্রধান নেতিবাচক আবেগের কথাও উল্লেখ করা হলো। তবে অবচেতন মনকে যখন হুকুমজারী করবেন তখন অবশ্যই নেতিবাচক আবেগগুলোকে এড়িয়ে যাবেন।

সাতটি প্রধান ইতিবাচক আবেগ

১. আকাঙ্ক্ষা

২. বিশ্বাস

৩. প্রেম

৪. সেক্স

৫. উৎসাহ

৬. রোমাঞ্চ

৭. আশা

আরো কিছু ইতিবাচক আবেগ রয়েছে তবে এই সাতটিই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সৃষ্টিশীল কর্মে এগুলোরই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। এই সাতটি আবেগ ধারণ করুন। (শুধুমাত্র ব্যবহারের মাধ্যমে এগুলো ধারণ করা যাবে) এবং অন্যান্য ইতিবাচক আবেগগুলো আপনি চাইলেই আপনার কাছে এসে হাজির হয়ে যাবে, যখনই প্রয়োজনবোধ করবেন।

সাতটি প্রধান নেতিবাচক আবেগ

(এই আবেগগুলো এড়িয়ে চলবেন)

১. ভয়

২. হিংসা বা ঈর্ষা

৩. ঘৃণা

৪. প্রতিশোধ

৫. লোভ

৬. কুসংস্কার

৭. ক্রোধ

ইতিবাচক এবং নেতিবাচক আবেগ একই সময় মনকে দখল করে রাখতে পারে না। একটি আরেকটির ওপর কর্তৃত্ব করে। এটি আপনারই দায়িত্ব দেখা যে আপনার ইতিবাচক আবেগগুলো দ্বারা আপনার মন প্রভাবিত হচ্ছে। এখানে

অভ্যাসের আইন আপনার সাহায্যে আসতে পারে।

ইতিবাচক আবেগগুলো প্রয়োগ এবং ব্যবহারের চেষ্টা করুন। তাহলে অবশেষে এগুলো আপনার মনের ওপর এমনভাবে কর্তৃত্ব করবে যে নেতিবাচক আবেগ ওখানে প্রবেশের সুযোগই পাবে না।

এই নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে এবং ক্রমাগত মেনে চললেই কেবল আপনার অবচেতন মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে পারবেন। আপনার সচেতন মনে যদি একটিমাত্র নেতিবাচক চিন্তা থাকে সেটিই আপনার অবচেতন মনের সকল গঠনমূলক সাহায্যকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

আপনি যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হন তাহলে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন বেশিরভাগ মানুষই সবকিছু ব্যর্থ হওয়ার পরে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনায় বসে। অথবা তারা অর্থহীন সব প্রার্থনা করে। এসব মানুষ সবকিছু হারানোর পরে প্রার্থনায় যখন যায় তখন তাদের মনে বাস করে **ভয়** এবং **সন্দেহ**। আর এই আবেগগুলো নিয়ে অবচেতন মন কাজ করে এবং অসীম বুদ্ধিমত্তার কাছে এগুলোকে পাঠিয়ে দেয়।

আর অসীম বুদ্ধিমত্তা এ আবেগুলো রিসিভ করে সে মতে কাজ করতে থাকে।

আপনি যখন প্রার্থনা করবেন, সে প্রার্থনায় যদি ভীতি এবং সন্দেহ মিশে থাকে কিংবা আপনার প্রার্থনা নিয়ে যদি অসীম বুদ্ধিমত্তা কাজ না করে তবে সেই প্রার্থনা বিফলেই যাবে! প্রার্থনা করতে হবে মন দিয়ে, যেখানে কোনো শঙ্কা বা ভীতি কাজ করবে না।

একটা সময় আসবে যখন দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে 'Science of Prayer' পড়ানো হবে। যখন এ সময়টি আসবে (এ সময়টি অবশ্যই আসবে কারণ মানবসভ্যতা এটি দাবি করে) তখন ইউনিভার্সাল মাইন্ডে ভয়-ভীতির আর জায়গা থাকবে না। অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং ভুয়া শিক্ষা দূর হয়ে যাবে, মানুষ অসীম বুদ্ধিমত্তার সন্তান হিসেবে তার প্রকৃত স্ট্যাটাস অর্জন করবে। যদিও এ মুহূর্তেই কিছু মানব সন্তান রয়েছেন যারা এই গুণে গুণান্বিত।

আপনার যদি মনে হয় এ ভবিষ্যৎদ্বাণী সুদূর কল্পনাপ্রসূত তাহলে আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই একশো বছরেরও কম সময় আগে লোকে বজ্র-বিদ্যুৎকে ঈশ্বরের ক্রোধ বলে মনে করত এবং ভয় পেত। এখন বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষ বিদ্যুৎ তৈরি করে তা শিল্প কারখানায় ব্যবহার করছে। একশো বছর আগে লোকে ভাবত গ্রহগুলোর মাঝখানে শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই,

মৃত। এখন লোকে জানে গ্রহের মাঝখানের শূন্যতা জীবন্ত।

অবচেতন মন হলো যোগাযোগের একটি মাধ্যম যা একজনের প্রার্থনাকে টার্মসে রূপান্তরিত করে যাতে অসীম বুদ্ধিমত্তা তাকে চিনতে পারে এবং এই মেসেজটি উপস্থান করার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অথবা আইডিয়ার আকারে প্রার্থনাকারীর কাছে জবাব পৌছে দিতে পারে।

আপনার প্রার্থনা অসীম বুদ্ধিমত্তার কাছে পৌছাবার আগে এটি সম্ভবত এর মূল চিন্তার কম্পন থেকে রূপান্তরিত হয়ে স্পিরিচুয়াল ভাইব্রেশনের টার্মসে পরিণত হয়। বিশ্বাস একমাত্র মাধ্যম যা আপনার চিন্তাকে স্পিরিচুয়াল একটি প্রবৃত্তি এনে দেবে। **বিশ্বাস** এবং **ভয়** পরস্পরের বন্ধু হতে পারে না। যেখানে একজনকে দেখা যায় সেখানে আরেকজন থাকতে পারে না।

ষোলো

মস্তিষ্ক

চিন্তা গ্রহণ এবং প্রেরণের ষ্টেশন

ধনী হওয়ার দ্বাদশ পদক্ষেপ

কুড়ি বছরেরও আগে এ বইয়ের লেখক প্রয়াত ড. আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল এবং ড. এলমার আর. গেটসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারেন প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্ক চিন্তার কম্পন গ্রহণ ও প্রেরণের ষ্টেশন হিসেবে কাজ করছে।

ইথারকে কাজে লাগিয়ে, রেডিও সম্প্রচারের মতোই, প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্ক অপর মস্তিষ্ক থেকে রিলিজ হওয়া মস্তিষ্কের কম্পন তুলে নিতে পারে।

সৃজনশীল কল্পনাশক্তিকে মস্তিষ্কের 'রিসিভিং সেট' হিসেবে অবহিত করা যায় যেটি অন্যদের রিলিজ করা চিন্তাগুলোকে রিসিভ করে। এটি হলো, একজনের সচেতন মনের যোগাযোগ করার মাধ্যম, এটি চারটি সোর্সেরও মাধ্যমে ঘটে যা থেকে যে কেউ চিন্তার উদ্দীপনা রিসিভ করতে সক্ষম।

যখন কম্পনের মাত্রা উঁচুতে উঠে যায় মন উত্তেজিত হলে, তখন চিন্তার কম্পনের প্রতি মন আরো বেশি গ্রহণোন্মুখ হয়ে ওঠে যেটি বাইরের উৎস থেকে ইথারের মাধ্যমে পৌঁছায়। এই 'পদক্ষেপণ' প্রক্রিয়া ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক আবেগ দ্বারা মনে জায়গা করে নেয়। আবেগের সাহায্যে চিন্তার কম্পন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অত্যন্ত উঁচু মাত্রার কম্পনই কেবল ইথার তুলে নেয় এক মস্তিষ্ক থেকে অপর মস্তিষ্কে। কম্পনের উঁচুমাত্রায় চিন্তাশক্তি ভ্রমণ করে এবং এক মস্তিষ্ক থেকে অপর মস্তিষ্কে ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়। এভাবে আপনি দেখতে পাবেন আপনার চিন্তার আবেগ কিংবা মিশ্রিত আবেগগুলো আপনার অবচেতন মনে পৌঁছে যাচ্ছে।

অবচেতন মন হলো মস্তিষ্কের 'Sending Station' যার মাধ্যমে চিন্তার কম্পন ব্রডকাস্ট হয়। সৃজনশীল কল্পনা হলো 'Receiving Set' যার মাধ্যমে চিন্তার কম্পন ইথার থেকে তুলে নেয়া হয়।

অবচেতন মনের গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরগুলোসহ এবং সৃজনশীল কল্পনার ফ্যাকাল্টি

যাতে আপনার মানসিক ব্রডকাস্টিং মেশিনারি থাকে (সেন্ডিং এবং রিসিভিং সেট) তা অটো-সাজেশনের বিষয়টি বিবেচনা করে যা একটি মিডিয়াম বলে বিবেচিত এবং যার সাহায্যে আপনি আপনার 'ব্রডকাস্টিং' স্টেশন চালাতে পারছেন।

অটো-সাজেশনের অধ্যায়ে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী আপনি নিশ্চয় সেই মেথডটি জেনে গেছেন যে আকাঙ্ক্ষাকে টাকায় রূপান্তর ঘটানো যায়।

আপনার মানসিক 'ব্রডকাস্টিং' স্টেশনের কাজের প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে বেশ সহজ। আপনাকে তিনটি তত্ত্ব মনে রাখতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে যখন আপনি আপনার ব্রডকাস্টিং স্টেশন চালানোর অভিলাষ ব্যক্ত করবেন। এগুলো হলো—**অবচেতন মন, সৃষ্টিশীল কল্পনা** এবং **অটো-সাজেশন**।

টেলিপ্যাথি

মাসখানেক আগে আমরা এ কাগজে প্রফেসর রাইন এবং ডিউক ইউনিভার্সিটিতে তাঁর সহযোগীদের অর্জিত ফলাফল প্রকাশ করেছিলাম যাতে 'টেলিপ্যাথি' এবং 'ক্লেয়ারভয়েন্স' এর অস্তিত্বের বিষয়ে শতাধিক পরীক্ষার কথা বলা হয়েছিল। এ ফলাফল হার্পারস ম্যাগাজিনের প্রথম দুটি নিবন্ধে প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় নিবন্ধে লেখক ই.এইচ.রাইট যা জানতে পেরেছেন তার সারমর্ম দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

'রাইনের গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী টেলিপ্যাথি এবং ক্লেয়ারভয়েন্সের (অলোকদৃষ্টি বা অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি—অনুবাদক) প্রকৃত অস্তিত্বে এখন কিছু কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন। বহু লোককে অসংখ্য কার্ড দেয়া হয়েছে একটি বিশেষ প্যাকেটে এবং ওই দিকে না তাকিয়েই ওখানে কী কী তাস আছে তা বুঝাতে বলা হয়েছে। এবং অনেকেই এ পরীক্ষায় উতরে গেছে। তারা সঠিক জবাব দিতে পেরেছে।

তারা তাসের দিকে না তাকিয়ে এ কাজটি কীভাবে করতে পারল? এটি এক ধরনের ক্ষমতা যাকে টেলিপ্যাথি বলে সম্বোধন করা হয়। যদিও অনেকের ধারণা এরকম কোনো ক্ষমতা মানুষের থাকতে পারে না। এই এক্সপেরিমেন্টটি শত মাইল দূরের দূরত্ব থেকেও করা হয়েছে। এবং এখানেও কোনো ভুল হয়নি। মি. রাইটের মতে, টেলিপ্যাথি কিংবা ক্লেয়ারভয়েন্সের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য এটি একটি প্রচেস্টা। এটি রেডিয়েশনের এক ধরনের ফিজিকাল থিয়োরি। রেডিয়েট এনার্জির সকল গঠন বা আকার দূরত্বের কারণে দুর্বল হয়ে পড়লেও টেলিপ্যাথি এবং ক্লেয়ারভয়েন্স তা করে না। তবে ব্যক্তি বিশেষে এটি আলাদাভাবে কাজ করে।

তবে টেলিপ্যাথি শক্তির অধিকারীরা ঘুমিয়ে পড়লে কিংবা আধাঘুমন্ত অবস্থায় থাকলে তাদের ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারে না। পারে কেবল পূর্ণজাগ্রত অবস্থায় এবং সতর্ক থাকলে।

রাইট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন টেলিপ্যাথি এবং ক্লেয়ারভয়েন্স বা অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি এক ধরনের আশীর্বাদ। অনেকের মধ্যেই এই দুটি গুণই

থাকে। আর টেলিপ্যাথির ক্ষমতা প্রয়োগে তাদের সামনে দেয়াল, পর্দা বা দূরত্ব কোনো কিছুই বাধা নয়। একে ESP বা extra censory experience-ও বলা যায়। ESP শক্তির বলে অনেকেই আগে থেকেই প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের আভাস বা ইংগিত পেয়ে যায়।'

ড. রাইনের এ ঘোষণায় তিনি যে ESPর কথা বলেছেন তা আসলে মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের শক্তি যেটি সম্পর্কে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

সতের

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়

জ্ঞানের মন্দিরের দরজা

ধনী হওয়ার ত্রয়োদশ পদক্ষেপ

ত্রয়োদশ পদক্ষেপটি হলো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, যার সাহায্যে অসীম বুদ্ধিমত্তা বা ব্যক্তি বিশেষের দাবি বা প্রচেষ্টা ছাড়াই স্বেচ্ছায় যোগাযোগ করতে পারে।

এই প্রিন্সিপালটিকেত বলা যায় দর্শনের শীর্ষ বিন্দু। বাকি বারোটি প্রিন্সিপাল আয়ত্ত করার পরেই কেবল এটি আত্মীকৃত অনুধাবন এবং প্রয়োগ করা সম্ভব।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হলো, অবচেতন মনের একটি অংশ বা ভাগ যা সৃজনশীল কল্পনা বলেও অভিহিত করা চলে। একে রিসিভিং সেটও বলে যার সাহায্যে মনে ঝিলিক দেয় আইডিয়া, প্ল্যান এবং চিন্তা। এই চলে আসা বা ঝিলিক দেয়াকে কখনো কখনো 'Hunch' কিংবা 'Inspirations' বলা হয়।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এমন একটি বিষয় যা, যে ব্যক্তি এই দর্শনের অন্যান্য প্রিন্সিপালগুলো আয়ত্ত করতে পারেনি তাকে বোঝানো যায় না। কারণ এরকম মানুষের জ্ঞানগম্যি বলতে কিছু নেই। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুল্য কোনো অভিজ্ঞতাও তারা সঞ্চয় করেনি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে বুঝতে হলে মনের উন্নয়ন ঘটিয়ে মেডিটেশন বা ধ্যান করতে হবে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সম্ভবত মানুষের অসীম এবং সসীম বুদ্ধিমত্তার সংযোগ-মাধ্যম এবং এ কারণে এটি মেন্টাল এবং স্পিরচুয়াল উভয়ের একটি মিশ্রণ। বিশ্বাস করা হয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইউনিভার্সাল মাইন্ডের সঙ্গে মানুষ যোগাযোগ করতে পারে।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আপনি আসন্ন বিপদ টের পেয়ে তা এড়িয়ে যেতে পারেন কিংবা সুযোগের সম্ভাবনা দেখলে তাকে আলিঙ্গনও করতে পারেন।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হলো আপনার 'Guardian angel' যেটি আপনার জ্ঞানের মন্দিরের দরজা সর্বদা খুলে রাখবে।

আপনি একের পর এক পদক্ষেপ ফেলে অবশেষে শেষ প্রিন্সিপালে এসে

পৌঁছেছেন। আপনি যদি আগের প্রিন্সিপালগুলো আয়ত্ত করে থাকেন তবে বর্তমানটি গ্রহণ করার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে যান এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মনে কোনো সন্দেহ বা সংশয় রাখবেন না। তবে আগের প্রিন্সিপালগুলো আত্মীভূত করতে না পারলে এটি আপনার খুব একটা কাজে আসবে না।

আমি যখন 'হিরো পূজা'র বয়সে তখন যাদের ভক্ত ছিলাম তাদেরকে অনুসরণের চেষ্টা করতাম। আমি তখন বিশ্বাসের উপাদান আবিষ্কার করি যা দিয়ে আমার আইডলদের নকল করতাম। বিশ্বাসের জোর ছিল বলেই আমি সফলভাবে কাজটি করতে পেরেছিলাম। অনেক অনেক আগে আমি যখন একটা লাইনও লেখার সাহস করতাম না কিংবা সবার সামনে বক্তৃতা দেয়ার হিম্মত দেখতাম না, ওই সময় আমি নিজেকে বদলে ফেলার চেষ্টা করি এবং অনুসরণ করতে থাকি নয়জন বিখ্যাত মানুষকে যাঁদের জীবন ও কর্মজীবন আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করত। এই নয়জন হলেন এমারসন, পেইন, এডিসন, ডারউইন, লিংকন, বুরবাংক, নেপোলিয়ান, ফোর্ড এবং কার্নেগি।

প্রতি রাতে বহু বছর ধরে আমি কাল্পনিক একটি কাউন্সিল মিটিং করতাম এ দলটির সঙ্গে যার নাম দিয়েছিলাম 'অদৃশ্য কাউন্সেলর।'

আমি যা করতাম তা হলো, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমি চোখ বুজে কল্পনায় দেখতাম এই মানুষগুলো আমার কাউন্সিল টেবিল ঘিরে আমার সঙ্গে বসে আছেন। আমি শুধু এদের সঙ্গে বসার সুযোগই নিতাম না, দলটির নেতৃত্বও দিতাম কারণ, আমি ছিলাম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান।

প্রতি রাতে আমার এই কাল্পনিক মিটিংয়ের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল এমনভাবে নিজেকে গড়ে তুলব যাতে আমার মধ্যে আমার কাল্পনিক কাউন্সেলরদের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে। আমি আমার কৈশোর বয়সেই বুঝে ফেলেছিলাম আমাকে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের বেড়াজাল টপকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি যেভাবে নিজেকে পুনরায় গড়ে তুলেছিলাম সেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজগুলোর কথা এখানে বর্ণনা করলাম।

অটো-সাজেশনের মাধ্যমে চরিত্র গঠন

মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি জানতাম মানুষ যা চায় তা হতে পারে কারণ তাদের কর্তৃত্ববাদী প্রবল আকাঙ্ক্ষার একটি প্রভাব রয়েছে যার সাহায্যে আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপান্তর করা সম্ভব। জানতাম চরিত্র গঠনে সেলফ সাজেশন একটি শক্তিশালী ফ্যাক্টর।

মনের চালিকাশক্তির এই জ্ঞানের প্রিন্সিপালগুলো জানা থাকার সুবাদে আমি আমার চরিত্র পুনর্গঠন করতে চেয়েছি। আমার কাল্পনিক কাউন্সিল মিটিংয়ে আমার কেবিনেট সদস্যদেরকে আহ্বান করেছি এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে যা বলেছি তা হলো

'মি. এমারসন, আমি আপনার কাছ থেকে প্রকৃতিকে বুঝবার জ্ঞান চাই। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আমার অবচেতন মনে বিরাট একটি প্রভাব বিস্তার করুন আপনার সমস্ত জ্ঞান গরিমা নিয়ে যার সাহায্যে আপনি প্রকৃতির আইন বুঝতে পেরেছেন এবং তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়েও নিয়েছেন। এর শেষ যে জ্ঞান আছে তা শেখার জন্য আপনার সহযোগিতা কামনা করছি।

'মি. বুরব্যাংক, আপনিও আমাকে প্রকৃতির আইন বুঝতে সাহায্য করুন।'

'নেপোলিয়ন, আপনার কাছে আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে আপনি কী করে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন তা আমাকে শিখিয়ে দিন। আমার ভেতরে বিশ্বাসের বীজ বপণ করুন যে বিশ্বাসের কারণে আপনি পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করেন এবং সকল বাধা দূর করেন। নিয়তির সম্রাট, ভাগ্যের রাজা, আমি আপনাকে সেলুট করি!

'মি পেইন, আপনার কাছে আমার চাওয়া আমাকে শিখিয়ে দিন চিন্তার স্বাধীনতা কীভাবে পাওয়া যায়।

'মি. ডারউইন, আপনার কাছ থেকে আমি শিখতে চাই কীভাবে ধৈর্য ধরে থাকতে হয়।

'মি. লিংকন, আমি নিজেকে গড়ে তুলতে চাই ন্যায় বিচার, ধৈর্যশক্তি, রসবোধ, মানুষকে বুঝাবার ক্ষমতা এবং সহিষ্ণু একজন মানুষ হিসেবে। এ সমস্ত গুণই আপনার মাঝে ব্যাপক পরিমাণে রয়েছে।

'মি. কার্নেগি, আমি আপনার কাছে ঋণী কারণ আপনি ইতোমধ্যে ঠিক করে

দিয়েছেন আমার কী কাজ করা উচিত। এটি আমার মনে প্রবল শান্তি এবং সুখ এনে দিয়েছে। আমি সংগঠিত প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্যগুলো আপনার কাছ থেকে শিখতে চাই যার সাহায্যে আপনি বিশাল একটি শিল্প-সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন।

'মি. ফোর্ড, আপনি আমার কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি উপাদান সরবরাহ করেছেন। আপনার কাছ থেকে আমি পেতে চাই আপনার লেগে থাকার ক্ষমতা, দৃঢ়তা, ভারসাম্য এবং আত্মবিশ্বাস যার সাহায্যে আপনি দূর করেছেন দারিদ্র্য, আপনি মানুষকে সংগঠিত এবং একত্রিত করতে পেরেছেন। আমিও আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুষকে সাহায্য করতে চাই।

'মি. এডিসন, আমি আপনার সবচেয়ে কাছে, ডানদিকে বসেছি কারণ আপনি আমাকে সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণের সময় ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেছেন। আপনার কাছ থেকে আমি বিশ্বাসের অফুরন্ত স্পিরিট পেতে চাই যা দিয়ে আপনি প্রকৃতির অনেক গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন।'

আমি এই মানুষগুলোর জীবন কাহিনী অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছি এবং কয়েকমাস এদের সঙ্গে কাল্পনিক মিটিং করার পরে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি এরা কখন যেন বাস্তবের মানুষ হয়ে আমার কাছে ধরা দিয়েছেন।

এই নয়জন মানুষের প্রত্যেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল আলাদা। যেমন লিংকনের সবসময় দেরি করে আসার অভ্যাস। তিনি মিটিংয়ে এসে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করেন। আর আসবার সময় তাঁর হাঁটার গতি থাকে অত্যন্ত মন্থর, হাত জোড়া পেছনে জড়ো করা এবং আমার সামনে থেকে যাওয়ার সময় প্রতিবার একবার করে থামতেন এবং আমার কাঁধে হাত রাখতেন। তাঁর চেহারায় সবসময়ই একটি সিরিয়াস ভাব। তাঁকে খুব কমই আমি হাসতে দেখেছি। বিযুক্ত একটি জাতির জন্য সব সময়ই চিন্তায় তাঁর মুখ ভার থাকত।

তবে অন্যরা আবার অন্যরকম ছিলেন। বুরব্যাংক এবং পেইন এমন কাঠখোট্টা কথা বলতেন, মুখে মুখে জবাব দিতেন যে কেবিনেটের অন্যান্য, সদস্যরা স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। এক রাতে পেইন প্রস্তাব দিলেন আমাকে 'the age of reason'এর ওপর একটি বক্তৃতা দিতে হবে। এবং বক্তৃতাটি দিতে হবে গির্জার উঁচু একটি বেদি থেকে যেখানে একবার আমি গিয়েছিলাম। এ কথা শুনে টেবিলের সবাই হেসে উঠলেন, নেপোলিয়ন বাদে। তিনি প্রবল আপত্তি জানালে সবাই তাঁর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন। নেপোলিয়নের কাছে গির্জা ছিল রাষ্ট্রের বন্ধকী সম্পদ।

একবার বুরব্যাংক দেরি করে মিটিংয়ে এলেন। আসার পরে তাঁকে খুব উত্তেজিত লাগছিল। তিনি বললেন, তিনি যে কোনো গাছে যাতে আপেল ফলানো যায় তার গবেষণা করছেন। পেইন তাঁকে ঠাট্টা করে স্মরণ করিয়ে দিলেন একটি আপেলই কিন্তু নারী-পুরুষের মধ্যে সকল ঝামেলার কারণ ছিল। ডারউইন দিলখোলা হাসি হেসে বললেন, পেইনের উচিত জঙ্গলে গেলে ছোট ছোট সাপ খুঁজে বের করা। কারণ ওগুলো বড় হয়ে বৃহৎ সর্পে পরিণত হবে। এমারসন মন্তব্য করলেন, 'সাপ নেই তো আপেলও নেই।' নেপোলিয়ন বললেন, 'আপেল নাই তো দেশও নাই।'

প্রতি মিটিংয়ে সবার শেষে বিদায় নিতেন লিংকন। একবার তিনি বুকে হাত বেঁধে টেবিলের শেষ প্রান্তে ঝুঁকে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। আমি তাঁকে বিরক্ত করলাম না। অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে মাথা তুললেন, চেয়ার ছেড়ে হেঁটে এগোলেন দরজায়, তারপর ফিরে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'খোকা, জীবনে উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাইলে দৃঢ় এবং অবিচল থাকার জন্য প্রচুর সাহসের দরকার।'

এক রাতে এডিসন সবার আগে চলে এলেন। তিনি আমার বাম পাশে এসে বসলেন যেখানে সাধারণত: এমারসন বসেন। তিনি বললেন, 'তুমি জীবনের গোপন রহস্য আবিষ্কারের সাক্ষী হয়ে থাকবে। যখন সময় আসবে দেখবে জীবন গড়ে উঠেছে শক্তি অথবা স্বতন্ত্র সত্তা দিয়ে। জীবনের এই ইউনিটগুলো মৌচাকের মতো এবং এগুলো নানা অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত একই সঙ্গে থাকবে। যখন একতা বা ঐকতান থাকবে না তখন এটি ভেঙে যাবে। মানুষের মতো এ ইউনিটগুলোর মতামতেও রয়েছে ভিন্নতা এবং প্রায়ই এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। তুমি যে মিটিংগুলোর আয়োজন করছ তা তোমার খুব কাজে আসবে। জীবনের কিছু ইউনিট থেকে তোমাকে এঁরা রক্ষা করবেন। 'তোমার কেবিনেটের সদস্যরা তাঁদের জীবদ্দশায় একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই ইউনিটগুলো অনন্ত। **এঁদের মৃত্যু নেই**। তোমার নিজের চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষা চুম্বক হিসেবে কাজ করবে যা আকর্ষণ করবে জীবনের ইউনিটকে, কারণ বাইরেই তো পড়ে রয়েছে জীবন সাগর। শুধু বন্ধুসুলভ ইউনিটগুলোকে আকর্ষিত করতে হবে যারা তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণে একত্রিত থাকবে।'

এই কাল্পনিক মিটিংগুলো যখন চিন্তা করতাম তখনও কিন্তু এডিসন বেঁচে আছেন। বিষয়টি আমাকে এতটাই অভিভূত করে তোলে যে আমি একদিন তার

সঙ্গে দেখা করতে যাই এবং আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। তিনি সব শুনে হাসতে হাসতে বলেন, 'তুমি যা কল্পনা করেছিলে তাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে তোমার স্বপ্ন এখন অনেক বেশি বাস্তব হয়ে গেছে।' ব্যস, আর কোনো ব্যাখ্যায় তিনি যাননি।

এই মিটিংগুলো এতটাই বাস্তবিক হয়ে ওঠে যে আমি এগুলোর পরিণামের কথা ভেবে ভয় পেয়ে যাই এবং বেশ কয়েকমাস এরকম কল্পনা করা থেকে বিরত থাকি। অভিজ্ঞতাগুলো বড্ড গা ছমছমে ছিল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এই ভেবে যে এভাবে চলতে থাকলে আমি হয়তো আর বিশ্বাসই করব না যে এগুলো স্রেফ আমার কল্পনা।

আমি আমার প্রাকটিস থেকে ছয় মাস দূরে থাকার পরে এক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি, অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছিল, লিংকন আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'শীঘ্রি পৃথিবীর তোমার সেবার দরকার হবে। যাও, তোমার কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ো এবং সমাপ্ত করো তোমার দর্শন। এটাই তোমার জীবনের মিশন। যদি কোনো কারণে এটি অবহেলা করো, তাহলে তুমি জীবনে কিছুই পাবে না।'

আমি বলতে পারব না পরদিন সকালে উঠে ঠিক কী মনে হয়েছিল আমার। সত্যি স্বপ্ন দেখছি কিনা জানি না। তবে ওটা স্বপ্ন হলেও এতটাই স্পষ্টভাবে জাগ্রত ছিল আমার মনে যে সেই রাতে আবার কল্পনায় মিটিংয়ের ছবি দেখতে থাকি।

পরের মিটিংয়ে কাউন্সিল সদস্যরা যে যার আসনের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। লিংকন হাতের মদের গ্লাস উঁচু করে বলেন, 'বন্ধুগণ, আসুন আজ আমরা সেই বন্ধুটির উদ্দেশ্যে পান করি যে আমাদের মাঝে আবার ফিরে এসেছে।'

এরপরে আমি আমার কেবিনেটে আরো নতুন নতুন সদস্য যুক্ত করতে থাকি। এদের মধ্যে ছিলেন যীশু খৃষ্ট, সেন্ট পল, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, অ্যারিস্টেটল, প্লেটো, সক্রেটিস, হোমার, ভলতেয়ার, ব্রুনো, স্পিনোযা, ড্রুমন্ড, কান্ট, অশেন হাউযার, নিউটন, কনফুসিয়াস, আলবার্ট হার্বাড, ব্রান, ইংগারসন, উইলসন এবং উইলিয়াম জেমস।

ওই কেবিনেট মিটিংগুলো সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও, এবং কেবিনেট সদস্যরা আমার কল্পনার সৃষ্টি যদিও, কিন্তু তাঁরা আমাকে অ্যাডেভেঞ্চারের এক গৌরবময় পথ দেখিয়েছেন, আমাকে সৃষ্টি করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং সৎ চিন্তা করতে শিখিয়েছেন। এই অদৃশ্য কাউন্সেলরা আমাকে আইডিয়া দিয়েছেন, চিন্তা

ভাবনা করতে শিখিয়েছেন এবং তাঁরা যে জ্ঞান বিতরণ করেছেন তা আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে। আমি নি:সংকোচে অদৃশ্য কাউন্সেলরদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এতসব আইডিয়া, ফ্যাক্টস এবং জ্ঞানের জন্য।

মাঝেমধ্যেই আমি এমন সব বিপদে পড়েছি যে আমার জীবনই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেইসমস্ত বাধা বিপত্তি পার করতে পেরেছি 'অদৃশ্য কাউন্সেলরদের' প্রভাবের কারণে।

আমি এবং আমার ক্লায়েন্টরা বর্তমানে কোনো সমস্যায় পড়লে তা সমাধানের জন্য আমার কাল্পনিক কাউন্সেলদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। এর ফলাফল বেশিরভাগ সময় বিস্ময়প্রদ হয়।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় একটি দারুণ বিষয় যা একজন মানুষকে তার কাঙ্ক্ষিত সম্পদ অর্জনে যথেষ্টই সহায়তা করতে পারে।

হেনরি ফোর্ড ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিষয়টি খুব ভালো বুঝতেন এবং এটির বাস্তব ব্যবহারও তিনি করেছেন। নিজের বিপুল ব্যবসা চালানোর জন্য এই প্রিন্সিপালটি বোঝা এবং ব্যবহার করা তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

প্রয়াত টমাস আলভা এডিসন এ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে ভালো বুঝতে পারতেন, আবিষ্কারের খাতিরে তিনি এটিকে নানান সময় ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে বেসিক পেটেন্টের সময়। কারণ এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার মতো তাঁর কেউ ছিল না। কথা বলার যন্ত্র এবং চলচ্চিত্র যন্ত্র নিয়ে কাজ করার সময় তিনি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রায় সকল বড় বড় মানব যাদের মধ্যে রয়েছেন নেপোলিয়ন, বিসমার্ক, জোয়ান অব আর্ক, ক্রাইস্ট, বুদ্ধ, কনফুসিয়াস এবং হযরত মোহাম্মদ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিষয়টি উপলব্ধি করতেন এবং একে ব্যবহারও করতেন। তাঁদের বেশিরভাগ কাজেই ওই জ্ঞানটি ব্যবহৃত হতো।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এমন কোনো বিষয় নয় যে, যে কেউ ইচ্ছে করলেই এটা তুলে নিয়ে নিজের ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারে। বিরাট শক্তি ব্যবহারের সামর্থ আসে মন্থর গতিতে, এ বইতে বর্ণিত অন্যান্য প্রিন্সিপালগুলোকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে। চল্লিশের আগে খুব কম মানুষের মধ্যেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। আর পঞ্চাশ পার হওয়ার পূর্বে এ বিষয়টি বুঝতেও পারে খুব কম লোকে।

আপনি যে-ই হোক অথবা যে উদ্দেশ্য নিয়েই এ বইটি পাঠ করুন না কেন,

এ অধ্যায়ে যে প্রিন্সিপালের কথা বলা হয়েছে তা ভালোভাবে অনুধাবন না করেও আপনি লাভবান হতে পারবেন। আপনার মূল উদ্দেশ্য যদি হয় অর্থ উপার্জন তবে এ কথাটি আপনার জন্য আরো বেশি প্রযোজ্য।

এ অধ্যায়টি পাঠ করার সময় আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন আপনার মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। চমৎকার! একমাস পরে এ লেখাটি আবার পড়ুন, আপনার মন আরো বেশি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। এ অভিজ্ঞতাটি বারবার অর্জন করতে থাকুন, কী শিখলেন বা কতটুকু শিখলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। একটা সময় দেখবেন আপনি আপনার হতাশা, ভয় ইত্যাদি ছুড়ে ফেলে দিতে পারছেন, কাজ করতে আর গড়িমসি করছেন না এবং স্বাধীনভাবে কল্পনা করতে পারছেন।

আর তখন আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করতে পারবেন।

বিশ্বাস বনাম ভয়!

আগেকার অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে অটো-সাজেশন দ্বারা কীভাবে বিশ্বাসের উন্নতি ঘটানো যায়। পরের অধ্যায়ে পড়বেন মন থেকে ভয় দূর করবেন কীভাবে।

যে ছয়টি ভয় সকল হতাশা, ভীরুতা, কর্মে অনীহা, ঔদাসীন্য, সিদ্ধান্তহীনতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব, সেলফ-রিলায়েন্সের অভাব, উদ্যমী হতে না পারা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, উৎসাহের অভাব ইত্যাদির জন্য দায়ী তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই ছয়টি শত্রু সম্পর্কে সতর্কভাবে সন্ধান করবেন কারণ এরা আপনার অবচেতন মনে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে এবং এদেরকে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন কাজ।

মনে রাখবেন 'ভয়ের ছয়টি ভূত' আসলে ভূত ছাড়া কিছুই নয় কারণ এগুলোর বাস কেবল মনের মধ্যে।

আরো স্মরণে রাখবেন অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাশক্তি দ্বারা সৃষ্ট এই ভূতগুলো মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ। এরা অত্যন্ত বিপজ্জনকও বটে।

১৯২৯ সালে দারিদ্র্যের ভয়ের ভূতটি লাখো মানুষের মনে এমনভাবে আসন গেড়ে নিয়েছিল যে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে মহা ধস নেমে যায়। এই ভূত এখনো আমাদেরকে ভয় দেখায়।

আঠারো

ভয়ের ছয়টি ভূতকে কীভাবে তাড়াবেন

এই দর্শনের যে কোনো অংশ সফলভাবে ব্যবহার করার আগে এটি রিসিভ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে এ প্রস্তুতি কঠিন কিছু নয়। এটি শুরু হবে আপনার তিনটি প্রধান শত্রুকে বুঝতে পারা, তাদেরকে নিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং এদেরকে ধ্বংস করতে হবে।

এই তিন শত্রুর নাম **সিদ্ধান্তহীনতা, সন্দেহ** ও **ভয়**।

এই তিনটি নেতিবাচক ধারণার একটিও যদি আপনার মনে আসন গেড়ে বসে থাকে তাহলে কাজ করবে না ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এই অশুভ ত্রয়ী পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, যেখানে একজনের দেখা মিললে অপরজন কাছাকাছি থাকবেই।

সিদ্ধান্তহীনতা হলো **ভয়ের** চারা। পড়ার সময় এ কথাটি স্মরণে রাখবেন, সিদ্ধান্তহীনতা থেকে উৎপত্তি সন্দেহের, এবং দুইয়ের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় **ভয়**। তবে এ মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি প্রায়ই মন্থরগতির হয়ে থাকে। এ কারণেই এই তিন শত্রু এত বিপজ্জনক। তারা অঙ্কুরিত হয় এবং নিজেদের উপস্থিতির জানান না দিয়েই বড় হতে থাকে।

ছয়টি মূল ভয়

বেসিক বা মূল ভয়ের সংখ্যা ৬। এগুলোর কোনো না কোনো একটির দ্বারা মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তবে পুরো ছয়টি ভয় যদি একজন মানুষকে গ্রাস করতে না পারে তাহলে তাকে সৌভাগ্যবান বলতেই হবে। যে ছয়টি ভয় সবচেয়ে কমন সেগুলো হলো

দারিদ্র্যের ভয়।

সমালোচনার ভয়।

রুগ্ন স্বাস্থ্যের ভয়।

প্রিয়জনের ভালোবাসা হারানোর ভয়।

বুড়ো হয়ে যাওয়ার ভয়।

মৃত্যু ভয়।

আরো কিছু ভয় আছে তবে সেগুলোকে খুব বেশি প্রাধান্য না দিলেও চলে। এই ছয়টি ভয়ের মধ্যেই সেগুলো এসে যায়।

এই ভয়গুলোর ব্যাপকতা পৃথিবীর জন্য একটি অভিশাপ, এগুলো চলে একটি বৃত্ত ঘিরে। প্রায় ছয় বছর ধরে আমরা যে মহামন্দার মধ্যে ছিলাম (১৯৩০ এর অর্থনৈতিক বিপর্যয়) সেটি ছিল দারিদ্র্যের ভয়। বিশ্বযুদ্ধের সময় (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ–অনুবাদক) আমরা ছিলাম **মৃত্যুভয়ের** বৃত্তে। যুদ্ধের পরের বছর আমাদেরকে রুগ্ন স্বাস্থ্যের ভয় তাড়িয়ে ফিরেছে। ওই সময় বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মহামারী।

ভয় আসলে একটি মানসিক অবস্থা ছাড়া কিছু নয়। এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। চিকিৎসকরা সাধারণ মানুষের চেয়ে কম রোগাক্রান্ত হন। এর কারণ তাঁরা অসুখে ভয় পান না। তিনি কোনোরকম ভয় ছাড়াই প্রতিদিন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত শত শত রোগীর সংস্পর্শে আসেন। এদের মধ্যে সুলি পক্সের রোগীও আছে প্রচুর। কিন্তু তিনি নিজে আক্রান্ত হন না। এর কারণ তিনি এসব রোগ নিয়ে ভীত নন।

দারিদ্র্যের ভয়

দারিদ্র এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে কোনো কম্প্রোমাইজ চলবে না। দুটি দুই ভিন্ন রাস্তায় চলে। আপনি ধনী হতে চাইলে দারিদ্র্যের যে কোনো বিষয় অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে। আর ধনী হওয়ার জন্য চাই মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা। আপনি প্রথম অধ্যায়েই পেয়ে গেছেন কীভাবে আকাঙ্ক্ষার ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে বিশদ নির্দেশাবলী। আর এ অধ্যায়ে পাবেন ভয়কে কীভাবে জয় করবেন এবং আকাঙ্ক্ষার বাস্তবসম্মত ব্যবহারে মনকে প্রস্তুত করার নির্দেশাবলী।

আপনি এ দর্শনটি কতটুকু হজম করতে পারবেন তার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছুই। এখানেই আপনি নিজের সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন যে ভবিষ্যতে আপনার জন্য আসলে কী রেখে দিচ্ছেন। এ অধ্যায়টি পাঠ শেষে আপনি যদি দারিদ্রকে গ্রহণ করতে চান তাহলে আপনার মনকে প্রস্তুত করুন দারিদ্র্যকে রিসিভ করার জন্য। এ সিদ্ধান্ত আপনি এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

আপনি যদি ঐশ্বর্যশালী হতে চান তাহলে সিদ্ধান্ত নিন ঠিক কত টাকা পেলে সন্তুষ্ট হবেন। আপনি ধনী হওয়ার রাস্তাটি চেনেন, আপনাকে ওই রাস্তার একখানা ম্যাপ দেয়া হয়েছে যা অনুসরণ করে রাস্তা চলতে থাকবেন। শুরুটা করতে যদি গড়িমসি করেন কিংবা পৌঁছাবার আগেই থেমে যান তাহলে এজন্য সম্পূর্ণভাবে আপনি একা দায়ী থাকবেন। এ দায়দায়িত্ব আপনার।

দারিদ্র্যের ভয় একটা মানসিক অবস্থা ছাড়া কিছু নয় তা একটু আগেও বলা হয়েছে। তবে এটি যে কোনো মানুষের অর্জনকে ম্লান করে দিতে পারে এবং এ সত্যটি বেদনাদায়কভাবে পরিস্ফূটিত হয়েছিল অর্থনৈতিক মহামন্দার সময়। এ ভয় যুক্তিকে নিশ্চল করে দেয়, কল্পনাশক্তিকে অচল করে ফেলে, সেলফ-রিলায়েন্সকে হত্যা করে, নিভিয়ে ফেলে উৎসাহ, উদ্যমকে নিরুৎসাহিত করে, উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে অনিশ্চয়তা, কাজে ঢিলেমিতে উৎসাহ দেয় এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণকে অসম্ভব করে তোলে। এটি একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের চার্ম টেনে নেয়, সঠিক চিন্তা করার সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে, ব্যাহত করে মনোযোগ, ধৈর্যের ওপর খোদকারী করে, ইচ্ছাশক্তিকে পরিণত করে শূন্যতায়, শেষ করে দেয়

উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ধূসর করে তোলে স্মৃতি এবং নানান চেহারায় হাজির হয়ে ব্যর্থতার আমন্ত্রণ জানায়। এটি ভালোবাসাকে হত্যা করে, অন্তরের সুকোমল আবেগগুলো নষ্ট করে দেয়, বন্ধুত্ব করতে বাধা দেয়, শত চেহারায় ডেকে নিয়ে আসে বিপর্যয়, নষ্ট করে নিদ্রা, টেনে নিয়ে যায় অশান্তি এবং অসুখের দিকে।

নি:সন্দেহে দারিদ্রের ভয় ভয়ের ছয়টি বেসিকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধ্বংসাত্মক। এটি তালিকার সবার ওপরে রয়েছে কারণ একে নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে কঠিন, এ ভয়ের উৎপত্তি খুঁজে বের করতে সেরকম সাহসের প্রয়োজন। এবং এ সত্যকে মেনে নেয়ার জন্য আরো বেশি সাহস দরকার। দারিদ্র্যের ভয় গড়ে ওঠে যখন মানুষ তার পড়শীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার দিকে নজর দেয়, তখন ইন্সটিংক্ট দ্বারা সকলেই পরিচালিত তবে জন্তু-জানোয়ারদের চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা সীমিত, তারা শারীরিকভাবে এতে অন্যের ওপর হামলা চালায়। কিন্তু ইনটুইশন দ্বারা চালিত, চিন্তা ও যুক্তি দিয়ে বিচার করতে সক্ষম মানুষ তার পড়শীকে শারীরিকভাবে ভক্ষণ না করলেও তার ধনসম্পদের ওপরে লোভ করে মানসিকভাবে তাকে ভক্ষণ করে।

মানুষ সম্পদ অর্জনে এতটাই ব্যাকুল যে সে ছলে বলে কৌশলে তা পেতে চায়। আর অনেকসময়ই তার ভেতরে কোনো যুক্তি কাজ করে না। কারণ তখন সে দারিদ্র্যের ভয় দ্বারা চালিত।

বেশিরভাগ মানুষকে যদি প্রশ্ন করেন সে কিসে ভয় পায়, বলবে আমি কিছুই ভয় পাই না। এটি সঠিক জবাব নয় কারণ খুব কম মানুষই বুঝতে পারে সে ভয়ের কাছে জিম্মি। এ ভয় এত সূক্ষ্ম এবং গভীরভাবে তার ভেতরে আসন গেড়ে রয়েছে যে মানুষ তার উপস্থিতি টের না পেয়ে সারাজীবন একে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। শুধুমাত্র সাহসী বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এই সর্বজনীন শত্রুর উপস্থিতি ফাঁস করে দেয়া সম্ভব। যখন আপনি এরকম কোনো বিশ্লেষণ করবেন, আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তা গভীরভাবে অসুসন্ধান করুন। এখানে ভয়ের কিছু লক্ষণের কথা বলা হলো যাতে আপনার চোখ বুলানো উচিত:

দারিদ্র্যের ভয়ের লক্ষণসমূহ

১. ঔদাসীন্য বা অনীহা : উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাবের মাধ্যমে এ জিনিসটির প্রকাশ ঘটে। ঔদাসীন্যের কারণে লোকে দারিদ্র সহ্য করে, জীবনে যা আছে তাকেই মেনে নেয় কোনোরকম প্রতিবাদ ছাড়াই। সে মানসিক এবং শারীরিকভাবে অলস হয়, তার ভেতরে উদ্যমের অভাব থাকে কল্পনা, উৎসাহ, আত্মনিয়ন্ত্রণ সবকিছুরই অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই সাথে সে সিদ্ধান্তহীনতায়ও ভোগে।

২. সন্দেহ : সন্দেহবাদীরা যে কোনো ব্যর্থতার জন্য নানান ছুতো দেয় এবং যারা সফল হয় মাঝে মাঝে তাদেরকে ঈর্ষা এবং সমালোচনা করে।

৩. দুশ্চিন্তা অন্যদের সঙ্গে কাজ করার সময় দুশ্চিন্তাবাদীরা নানান দোষ খুঁজে বেড়ায়, অপরের অর্থ তারা খরচ করে, পার্সোনাল অ্যাপিয়ারেন্সকে অগ্রাহ্য করে, সারাক্ষণ খিটমিট করে, বদমেজাজী হয়, এরা সারাক্ষণ মদ নিয়ে পড়ে থাকে, কখনো বা মাদকও গ্রহণ করে। এরা থাকে নার্ভাস, আত্ম-সচেতনতা এবং ভারসাম্যের অভাব থাকে তাদের, সেলফ-রিলায়েন্সও নয় এরা।

৪. অতিমাত্রায় সতর্কতা যে কোনো ঘটনায় শুধু নেতিবাচক দিকগুলোই এদের চোখে পড়ে, সাফল্যের বদলে সম্ভাব্য ব্যর্থতা নিয়েই সারাক্ষণ মেতে থাকে আলোচনায়। বিপর্যয়ের সবগুলো রাস্তাই তাদের চেনা অথচ ব্যর্থতা এড়ানোর জন্য কখনো পরিকল্পনা করে না। 'কখন সঠিক সময় আসবে' সেই আশায় বসে থেকে ভেরেণ্ডা ভাজে। আর অপেক্ষা করা তাদের জন্মের অভ্যাসে পরিণত হয়। তারা শুধু মনে রাখে কারা ব্যর্থ হলো তাদের কথা, অথচ সফল মানুষদের কথা ভুলে যায়। ডোনাটের ছিদ্রটাই দেখে, পুরো ডোনাট তাদের চোখে পড়ে না। এই হতাশাবাদীরা অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতে থাকতে দুশ্চিন্তার চোটে বদহজম বাঁধিয়ে ফেলে।

৫. কাজে গড়িমসি এরা সবসময় 'আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখে।' যে কাজটি গত বছরই করা সম্ভব ছিল সেটি আগামী বছর শেষ করবে বলে ফেলে রাখে। যে কোনো কাজ শেষ করার জন্য অ্যালিবাই এবং খোঁড়া যুক্তি খোঁজার পেছনে প্রচুর সময় নষ্ট করে। এ অভ্যাস দুশ্চিন্তা ও অতি মাত্রায়

সতর্কতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। লড়াই করার বদলে কম্প্রোমাইজ করে। সমস্যা এলে তার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে।

উপরোল্লিখিত অভ্যাসগুলোর যারা পরিবর্তন করতে জানে না দারিদ্র্য কখনো তাদের পিছু ছাড়ে না। দারিদ্র্যের ভয়কে জয় করতে হলে এই অভ্যাসগুলোর পরিবর্তন ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় নেই।

টাকা কথা বলে!

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করবে, 'তুমি কেন টাকা নিয়ে বই লিখলে?'

আমি কেন এ বইটি লিখলাম তার অন্যতম কারণ হলো পৃথিবীবাসী সম্প্রতি (১৯৩০-এর দশক—অনুবাদক) এমন এক ভয়ানক অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে গেছে যে দারিদ্র্যের ভয় কোটি কোটি নারী-পুরুষকে নিশ্চল করে দিয়েছিল। আমি চেয়েছি তারা যেন এ বইটি পড়ে অর্থ উপার্জনের একটি উপায় খুঁজে বের করতে পারে।

গরিব হওয়ার ভয় মানুষের কী দশা করতে পারে তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ওয়েস্টব্রুক পেগলার নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড টেলিগ্রামে। তিনি লিখেছেন:

'টাকা স্রেফ একটি ধাতব চাকতি কিংবা এক টুকরো কাগজ ছাড়া কিছু নয়। তবে মানুষের মনের মধ্যে যে সম্পদ রয়েছে তা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এ বিষয়টি মনে রাখতে সমর্থ হয় না এবং তাদের স্পিরিটও ধরে রাখতে পারে না। একজন লোক যখন রাস্তায় নেমে আসে, কোনো চাকরি খুঁজে পায় না, তখন তার স্পিরিট শ্লথ হয়ে আসে। চাকরিজীবী মানুষজনের মাঝে হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে সে যদিও জানে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধিমত্তা কিংবা সামর্থ্যের দিক থেকে সে এদের সমকক্ষ নয়।

মহিলারা হতাশা লুকিয়ে রাখে

মহিলাদের বিষযটি আবার ভিন্ন। তারা টাকা-পয়সার অভাবে থাকলেও খুব কমই তাদেরকে অন্যের কাছে হাত পাততে দেখা যায়। আর এই মহিলারা নিজেদের হতাশা গোপন রাখে। অনেক সময় তারা আত্মহত্যাও করে।

সমালোচনার ভয়

এ ভয়টি মানুষের মধ্যে কীভাবে গেড়ে বসে কেউ বলতে পারে না তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে এ ভয়টি তার মনে প্রবলভাবে কাজ করে। অনেকের ধারণা রাজনীতি যখন 'পেশা' হয়ে উঠল তখন থেকে এ ভয়টির সৃষ্টি। আবার অনেকে মনে করেন মহিলারা যখন নিজেদের 'স্টাইল' সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে, ওই সময় থেকে তারা সমালোচিত হওয়ার ভয়ে ভীত থাকতে শুরু করে।

সমালোচনার ভয় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, বেশিরভাগই ছোটখাট, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঘটে। টেকো মানুষরা ভয়ে থাকে লোকে তাদের টেকো বলে সমালোচনা করবে।

সমালোচনার ভয় করে না এমন মানুষ বিরল। তবে বেশিরভাগই এটি স্বীকার করতে চায় না। অনেকে উপকথায় বিশ্বাস করে কিন্তু তা স্বীকার করে না। কারণ যদি পাছে লোকে কিছু বলে! অনেকে ভূতে বিশ্বাস করলেও তা স্বীকার যায় না। তা-ও ওই সমালোচনার ভয়েই!

সমালোচনার ভয় একজন মানুষের উদ্যম নষ্ট করে দেয়, ধ্বংস করে তার কল্পনাশক্তি, তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, কেড়ে নেয় আত্মনির্ভরশীলতা এবং আরো শতাধিক উপায়ে তার ক্ষতি করে। বাবা-মা তাঁদের সন্তানদের ক্রমাগত সমালোচনা করে অনেক ক্ষতি করেন। শৈশবে আমার এক বন্ধুর মা আমার বন্ধুকে প্রায় প্রতিদিনই সমালোচনা করতেন, সবসময় বলতেন, 'কুড়ি বছর হওয়ার আগেই তোমাকে জেলের ঘানি টানতে হবে।' তাকে সতের বছর বয়সে একটি সংশোধনী কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

সমালোচনা করে সবচেয়ে ক্ষতি করে কাছের মানুষজন আত্মীয়-স্বজন। এটি আসলে একটি অপরাধ এবং বলা উচিত খুবই বাজে অপরাধ। কারণ বাবা-মা অপ্রয়োজনীয় সমালোচনা করে সন্তানের মধ্যে হীনমন্যতা তৈরি করেন। চাকরিদাতারা, যারা মানব প্রকৃতি ভালো বুঝতে পারেন, তাদের লোকজনের কাছ থেকে সেরা জিনিসটা আদায় করে নেন সমালোচনা করে নয়, গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে। বাবা-মা তাদের সন্তানদের কাছ থেকে একই রকমের ফলাফল পেতে পারেন। সমালোচনা মানুষের মনে ভয় প্রোথিত করবে অথবা আফসোস এটি ভালোবাসা কিংবা স্নেহ সৃষ্টিতে ব্যর্থ।

সমালোচনার ভয়ের লক্ষণ

এ ভয়টি দারিদ্র্যের ভয়ের মতোই সার্বজনীন এবং এর প্রভাব ব্যক্তিগত অর্জনের মতোই ভয়াবহ কারণ এই ভয় ধ্বংস করে দেয় উদ্যম, কল্পনা শক্তির ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করে তোলে।

এ ভয়ের মূল লক্ষণগুলো হলো

সচেতনতা: অচেনা লোকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সমালোচনার ভয়ে ভীত মানুষজন নার্ভাস হয়ে থাকে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত পা নাড়ে, চোখ নাড়াচড়া করে।

ভারসাম্যতার অভাব : কথা বলার সময় গলা কাঁপে, এদের স্মৃতি শক্তি দুর্বল থাকে।

ব্যক্তিত্ব সমালোচনার ভয়ে ভীত লোক সুদৃঢ়ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না, তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো চার্ম বা আকর্ষণ থাকে না, যে কোনো বিষয় মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে ওগুলো পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। অন্যদের মতামত ভালো করে না শুনেই তাদের সঙ্গে একমত পোষণ করে।

হীনমন্যতা এ ধরনের মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে বড় বড় বুলি কপচিয়ে অন্যদেরকে মুগ্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। অনেক সময় এরা জানেই না যে এরা কী বলছে। অন্যদের পোশাক, কথা বলার ঢঙ, আচার-আচরণ ইত্যাদি নকল করে। কাল্পনিক অর্জন নিয়ে গর্ব করে। এভাবে মাঝে মাঝে তারা ওপরে ওপরে একটু সুপরিওরিটি ভাব দেখায়।

অপচয় সমালোচনার ভয়ে ভীত মানুষ অসংযমী এবং অপচয়কারী হয়ে থাকে।

উদ্যমের অভাব এরা সুযোগ পেলেও তা হারায়, নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করে, নিজের আইডিয়ার বিষয়ে কোনো আত্মবিশ্বাসই থাকে না, সুপিরিয়র কোনো প্রশ্ন করলে তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা থাকে, তাদের আচার-আচরণ এবং কথা বলায় সর্বদাই আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্যণীয়, কাজে-কর্মে কোনো মিল নেই এবং শঠতা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব সমালোচনার ভয়ে ভীতদের থাকে মানসিক এবং শারীরিক আলস্য, থাকে স্বাধিকারের অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরগতিসম্পন্ন, সহজেই অপরের দ্বারা প্রভাবিত, অন্যদের পেছনে সমালোচনা করে কিন্তু সামনাসামনি হলে তোষামোদ করে, কোনোরকম প্রতিবাদ বা আপত্তি ছাড়াই মেনে নেয় পরাজয়, কেউ বিরোধিতা করলে উদযোগ থেকে সরে যায়, কোনো কারণ ছাড়াই অন্যদেরকে সন্দেহের চোখে দেখে, কৌশলীভাবে কথা বলতে জানে না, সেভাবে চলাফেরাও করতে পারে না এবং ভুল হলে তার দোষ স্বীকারও করে না।

রুগ্ন বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের ভয়

এ ভয়টি হতে পারে শারীরিক কিংবা বংশগত। এটি বুড়িয়ে যাওয়া এবং মৃত্যু ভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানুষ রুগ্ন বা ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ভীত কারণ তার মনের মধ্যে মৃত্যুভয়ের কিছু ভয়ংকর চিত্র ঢুকিয়ে দেয়া হয়। রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তার যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়টি ভেবেও ভীত হয় লোকে।

একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক বলেছেন যারা ডাক্তারের কাছে পেশাদারী সেবা পেতে যায় তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই হাইপোকনিড্রিয়া বা কাল্পনিক অসুস্থতায় ভুগছে। এরকম দেখা গেছে যে অসুখের ভয়, যদিও এ নিয়ে ভয় পাবার যেখানে বিন্দুমাত্র কারণই নেই, প্রায়ই এ ভীতি যে অসুখ নিয়ে একজন শঙ্কিত, সেটাই তার শরীরে বাসা বাঁধে।

মানুষের মন খুব শক্তিশালী। এটি ধ্বংস করতে পারে আবার সৃষ্টিও করতে জানে। রুগ্ন স্বাস্থ্যের ভয় নিয়ে মনের দুর্বলতা মানুষের অনেক ক্ষতি করতে পারে। বিশ্বযুদ্ধের সময় 'ফ্লু' রোগটি যখন মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ল, নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এ রোগের জন্যে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়া মানুজনকে ক্ষতি ঠেকাতে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সংবাদপত্র কর্মীদের ডেকে বলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদেরকে অনুরোধ করব 'ফ্লু' মহামারী নিয়ে পত্রিকায় আর কোনো ভীতিকর হেডলাইন লিখবেন না। আপনারা যদি আমাদেরকে সাহায্য না করেন তাহলে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। খবরের কাগজগুলো 'ফ্লু' নিয়ে গল্প ছাপানো বন্ধ করে দেয় এবং মাসখানেকের মধ্যে মহামারীটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।

বছর কয়েক আগে কতগুলো এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে লোকে স্রেফ কানকথা শুনেই অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। আমরা এই পরীক্ষাটি চালাই তিনজন লোককে নিয়ে। এদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করা হয় 'তোমার চেহারার এরকম দশা কেন? দেখে মনে হচ্ছে খুবই অসুস্থ।'

প্রথমজন একটি হাসি দিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জবাব দেয়, 'আরে না, আমি ঠিকই আছি।' দ্বিতীয় জন বলে, 'জানি না কেন তবে শরীরটা খারাপ লাগছে।' আর তৃতীয়জন বলে সে সত্যি অসুস্থ অনুভব করছে।

আমার কথা বিশ্বাস না হলে বিষয়টি নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তবে বেশি লোকের ওপর গবেষণা চালাতে যাবেন না যেন।

এরকম প্রমাণ রয়েছে মাঝে মাঝে রোগের উৎপত্তি হয় নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনার আবেগ থেকে। এ ধরনের আবেগ একজনের মন থেকে আরেকজনের মনে প্রবেশ করতে পারে স্রেফ তার কথা শুনেই।

ডাক্তাররা রোগীদেরকে তাদের স্বাস্থ্যের জন্য 'হাওয়া বদল' করতে যেতে বলেন কারণ 'মানসিক অবস্থার পরিবর্তনটি জরুরি। রুগ্ন বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের ভীতি প্রতিটি মানুষের মনেই বাস করে। দুশ্চিন্তা, ভয়, নিরুৎসাহ, ব্যবসা এবং প্রেমে হতাশা ইত্যাদি এই ভয়ের বীজটিকে অঙ্কুরিত করে এবং বৃদ্ধি করে। আমেরিকায় সম্প্রতি ব্যবসা-বাণিজ্যে যে হতাশা নেমে এসেছিল তাতে ডাক্তারদের সবসময় দৌড়ের ওপর থাকতে হয়েছে কারণ, তাদের কাছে হতাশাগ্রস্ত প্রচুর রোগী এসেছে চিকিৎসার জন্য।

রুগ্ন স্বাস্থ্যের ভয়ের কারণের তালিকায় শীর্ষে রাখা যেতে পারে ব্যবসা ও প্রেমে হতাশার বিষয়টি। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে এক তরুণকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে যেতে হয়েছে। সে কয়েকমাস জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিল। সাজেস্টিভ থেরাপিউটিক্সের একজন বিশেষজ্ঞকে ডাকতে হয়েছে তার জন্য। স্পেশালিস্ট বদলে সেখানে অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণীকে নিয়োগ দেয়া হয় যে (ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী) প্রথম দিনেই তরুণের সঙ্গে ভালোবাসাবাসি করার জন্য। তিন সপ্তাহ পরে তরুণ হাসপাতাল থেকে মুক্তি পায়, তখনও সে অসুস্থ তবে সম্পূর্ণ আলাদা একজন মানুষ। *সে আবার প্রেমে পড়েছে*। তার জন্য যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার পুরোটাই ভুয়া হলেও রোগী এবং নার্স কিছুদিন পরে পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ লেখাটি যখন লিখছি দু'জনেই তখন বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল।

রুগ্ন বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের লক্ষণসমূহ

প্রায় সর্বজনীন এ ভয়টির লক্ষণ হলো

অটো-সাজেশন: সেলফ-সাজেশনের নেতিবাচক ব্যবহার দ্বারা সব ধরনের রোগের লক্ষণ এরা খুঁজে বেড়ায়। কাল্পনিক রোগ 'উপভোগ' করে এবং এমনভাবে কথা বলে যেন এগুলো সব বাস্তব। অন্যদের সঙ্গে সবসময় অপারেশন, দুর্ঘটনা এবং অসুখের অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে থাকে।

এ ভয়ের লক্ষণের মধ্যে আরো আছে ডায়েট করা, প্রফেশনাল গাইড ছাড়াই শারীরিক অনুশীলন। ঘরে বসে চিকিৎসা, হাতুড়ে চিকিৎসার চেষ্টা ইত্যাদি।

হাইপোকনড্রিয়া অসুখ নিয়ে কথা বলার অভ্যাস, রোগ শোকের ওপর কেন্দ্রীভূত মনোযোগ, রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় করতে করতে শেষ পর্যন্ত নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়ে যায়। এ অবস্থার চিকিৎসা বোতলের ওষুধ দ্বারা সম্ভব নয়। শুধু নেতিবাচক চিন্তার কারণেই এ সমস্যার উদ্ভব এবং ইতিবাচক চিন্তা ছাড়া এ থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই। হাইপোকনড্রিয়া (কাল্পনিক রোগের একটি মেডিকেল টার্ম) একজন মানুষের ততোটাই ক্ষতি করতে পারে যতটা ক্ষতি করে কোনো অসুখের ভয়। বেশিরভাগ নার্ভজনিত রোগের উদ্ভব হয় এই কাল্পনিক অসুখ থেকে।

অনুশীলন রুগ্ন স্বাস্থ্যের ভয় প্রয়োজনীয় শারীরিক অনুশীলনকে ব্যাহত করে। লোকে বাইরে যেতে ভয় পায়, ভাবে রাস্তাঘাটে ওঁৎ পেতে থাকা জীবাণুর দল হামলে পড়বে। ফলে বাড়িতে বসে বসে তারা ফুলতে থাকে, ওভার ওয়েটের সমস্যায় আক্রান্ত হয়।

সংবেদনশীলতা ভগ্ন স্বাস্থ্য ভীতি প্রাকৃতিক শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয় এবং এমন অনুকূল একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যাতে যে কোনো রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। রুগ্ন স্বাস্থ্য ভীতি প্রায়ই দারিদ্র ভীতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, বিশেষ করে হাইপোকনড্রিয়াজের ক্ষেত্রে, যারা সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকে কীভাবে ডাক্তার এবং হাসপাতালের বিল মিটাবে সেই চিন্তা নিয়ে। এ ধরনের মানুষজন বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দেয় অসুস্থতার জন্য প্রস্তুতি নিতে,

মৃত্যু নিয়ে কথা বলে, কবরের জন্য জমি কেনার চিন্তা ইত্যাদিতে।

প্রশ্রয় দেয়া ভগ্ন স্বাস্থ্যের ভয়ে ভীত মানুষের অভ্যাস হলো কাল্পনিক অসুখের কথা বলে লোকের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে। আলস্য ঢাকা দিতে অসুখের ভান করা কিংবা এটিকে অ্যালিবাই হিসেবে ব্যবহার করা এক ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষারই অভাব।

পানাসক্তি : মাথা ব্যথা, স্নায়ুশুল ইত্যাদি রোগের ব্যথা উপশমে অ্যালকোহল কিংবা নারকোটিক্স ব্যবহার ভগ্ন স্বাস্থ্য ভীতিরই লক্ষণ।

প্রেম-ভালোবাসা হারানোর ভয়

ঈর্ষা কিংবা ডিমনেশিয়ার অন্যান্য ফর্ম থেকে সৃষ্টি হয় মানুষের মাঝে কারো প্রেম-ভালোবাসা হারানোর ভয়। ছয়টি মূল ভয়ের মাঝে এটি সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক। অন্যান্য বেসিক ভয়ের চেয়ে এটিই সম্ভবত: শরীর এবং মনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করে। কারণ এ থেকে একজন মানুষ স্থায়ীভাবে উন্মাদ হয়ে যেতে পারে।

প্রেম-ভালোবাসা হারানোর ভীতি সম্ভবত সেই প্রস্তর যুগ থেকে চলে আসছে যখন লোকে জোর করে নারী হরণ করত। তারা মেয়েদেরকে এখনো হরণ করে তবে কৌশলটি বদলে গেছে। গায়ের জোরের বদলে বর্তমানে তারা মেয়েদের পিছু লেগে থাকে, তাদেরকে সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড়, মোটর গাড়িসহ আরো নানান কিছু দেয়ার লোভ দেখায় যা শারীরিক শক্তি প্রয়োগের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের অভ্যাস একইরকম, কেবল নিজেকে উপস্থাপনের ঢঙটা বদলেছে।

সযত্ন বিশ্লেষণ এটাই দেখিয়েছে যে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই এই ভয়ে বেশি কাবু হয়ে থাকে। এর সহজ ব্যাখ্যাও আছে। মহিলারা অভিজ্ঞতা থেকে জানে পুরুষরা প্রকৃতিগতভাবেই বহুগামী এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে তাদেরকে তুলে দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না।

ভালোবাসা হারানোর ভয়ের লক্ষণ

এ ভয়ের বিশেষ লক্ষণসমূহ হলো

ঈর্ষা জোরালো বা যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়াই বন্ধু-বান্ধব কিংবা প্রিয় মানুষকে সন্দেহ করার অভ্যাস। (ঈর্ষা হলো dementia praecox-এর একটি আকার, যেটি মাঝে মাঝে অতি সামান্য কারণেই অতি ভয়ংকর চেহারা ধারণ করতে পারে) স্ত্রী বা স্বামীকে কোনো প্রমাণ ছাড়াই ব্যভিচারের সন্দেহ। সবাইকে সন্দেহ করা এবং কাউকেই একদম বিশ্বাস না করা।

দোষ খুঁজে বেড়ানো বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, ব্যবসায়ী সহযোগী এবং প্রিয়জনের সামান্যতম উস্কানিতেই দোষ খুঁজে বেড়ানো, অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়াই এরকমটি ঘটে।

জুয়া প্রেমিকার জন্য জুয়া, চৌর্যবৃত্তি, প্রতারণা এবং অন্যান্য কুকর্মের সাহায্যে অর্থ জোগাড় করা এ বিশ্বাস নিয়ে যে এ দিয়ে ভালোবাসা কেনা যায়। যখন কেউ তার প্রিয়জনের জন্য যথেচ্ছ ব্যয় করে এবং ঋণ করে তাকে উপহার কিনে দিতে, বুঝতে হবে প্রিয়জনকে হারানোর ভয় তার ভেতরে কাজ করছে। এ ভয়ে ভীতদের মধ্যে থাকে নিদ্রাহীনতা, নার্ভাসনেস, ধৈর্যের অভাব, দুর্বল ইচ্ছশক্তি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের অভাব, আত্মনির্ভরশীলতার অভাব এবং বদ মেজাজ।

বুড়িয়ে যাওয়ার ভয়

সবচেয়ে কমন এ ভয়ের লক্ষণগুলো হলো
মানসিক পরিপক্কতার বয়সে হীনমন্যতায় ভুগতে থাকা এবং চল্লিশ বছর বয়সে ভাবতে থাকা যে বয়সের কারণে যে কোনো সময় 'অক্কা' যেতে পারে। (অথচ সত্য এটাই যে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়ভাবে মানুষের সবচেয়ে উপযোগী বয়স হলো চল্লিশ থেকে ষাট)।

চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছরে পৌঁছালে 'বুড়ো হয়ে গেছি' এ ধরনের কথা বারবার বলতে থাকা অথচ এ বয়সটাই হলো জ্ঞান এবং স্বচ্ছ চিন্তা শক্তির বয়স।

উদ্যম, কল্পনা করার অভ্যাস এগুলোকে বিদায় জানানো এই ধুয়ো তুলে সে বুড়িয়ে গেছে বলে এই গুণগুলো আর চর্চা করার সময় নেই।

চল্লিশ বছর বয়সীরা যখন নিজেদেরকে আরো বেশি তরুণ দেখাতে তরুণদের মতো পোশাক পরে এবং তরুণদের মতো আচার-আচরণ করতে থাকে তখন তাদেরকে বন্ধুবান্ধব এবং অচেনা মানুষজন হাসিঠাট্টা করতে থাকলে তারা ভাবে যে তারা বুড়িয়ে গেছে।

মৃত্যু ভয়

সকল বেসিক ভয়ের মধ্যে নিষ্ঠুরতম ভয় হলো এটি। কারণটি স্পষ্ট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যু ভয় মানুষকে তাড়া করে ফেলে ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে। তথাকথিত 'বিধর্মীরা 'সুসভ্যদের চেয়ে কম মৃত্যু চিন্তায় ভোগে। কোটি কোটি মানুষ এখনও অব্যাখ্যাত প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে 'কোথা থেকে' এবং 'কোথায়'।

আমি কোথা থেকে এসেছি এবং আমি কোথায় যাব? অনেক মানুষই মৃত্যুর পরে অনন্তকাল নরকবাসের কথা ভেবে ভীত হয়। তারা মৃত্যু ভয়ে এতটাই ভীত থাকে যে সমস্ত যুক্তি হারিয়ে ফেলে। এ ভয় জীবনের প্রতি তার আগ্রহ ধ্বংস করে দেয় এবং তার জন্য সুখী হয়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গবেষণার সময় আমি একটি বই পড়েছিলাম 'A Catalogue of the Gods' ওতে ত্রিশ হাজার দেব দেবীর কথা বলা হয়েছে যাদেরকে লোকে পূজা করে। ভাবুন একবার! ত্রিশ হাজার দেবতা, আর তাদের কত বিচিত্র রূপ! চিংড়ি থেকে মানুষ! কাজেই মানুষ যে মৃত্যু ভয়ে ভীত থাকবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মৃত্যু ভয় তাদের অনেককেই এমন কাবু করে ফেলে যে তাদের জায়গা হয় পাগলা গারদে। আর সে কারণে অনেকেই পরিণত হয় উন্মাদে।

এই ভয়টি অর্থহীন। মানুষ যা-ই ভাবুক না কেন মৃত্যু অবধারিত। এটিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে হবে এবং এর চিন্তা মন থেকে দূর করে দেয়াই উচিত।

গোটা পৃথিবী গড়ে উঠেছে দুটি জিনিসের ওপর ভিত্তি করে '**এনার্জি** এবং **ম্যাটার**। পদার্থ বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠে আমরা পড়েছি ম্যাটার কিংবা এনার্জি সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংস করাও যায় না। ম্যাটার এবং এনার্জির রূপান্তর ঘটানো সম্ভব কিন্তু ধ্বংস করা সম্ভব নয়।

জীবন হলো এনার্জি বা শক্তি। যদি এনার্জি কিংবা ম্যাটার ধ্বংস করা না যায় তাহলে জীবনও ধ্বংস করা যাবে না। জীবন, শক্তির অন্যান্য গঠনের মতো

ট্রানজিশনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত কিংবা বদল ঘটানো সম্ভব, ধ্বংস করা সম্ভব নয়। মৃত্যু আসলে একটি ট্রানজিশন বা ক্রান্তিকাল মাত্র।

মৃত্যু যদি পরিবর্তন কিংবা ট্রানজিশন করা না যায় তাহলে মৃত্যুর পরে দীর্ঘ, অনন্ত, ক্লান্তিময় একটি নিদ্রা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আর নিদ্রাকে ভয় পাবার কিছু নেই। এভাবেই আপনি মৃত্যু ভয়কে চিরতরে মন থেকে মুছে দিতে পারেন।

মৃত্যু ভয়ের লক্ষণ

জীবন থেকে কিছু প্রাপ্তির বদলে সারাক্ষণই মরণের কথা চিন্তা করা। এটি ঘটে উদ্দেশের অভাব কিংবা ভালো কোনো পেশায় নিয়োজিত থাকতে না পারলে। এ ভয়টি বয়সীদের মধ্যেই বেশিরভাগ কাজ করলেও তরুণরাও এর শিকার হয়। মৃত্যুভয় তাড়ানোর শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো **কিছু অর্জনের জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা**।

একজন ব্যস্ত মানুষ খুব কমই মৃত্যু চিন্তা করে। সে জীবনের রোমাঞ্চকর দিকগুলো দেখে বলে মৃত্যুকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা করতে হয় না। দারিদ্রের ভয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে মৃত্যু ভয়ও জেঁকে বসে মনে। দারিদ্রের কারণে প্রিয়জনের মৃত্যু হতে পারে এরকম ভয়ই আসলে কাজ করে মনে। আবার কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুভয় চলে আসে অসুস্থতা এবং শারীরিক প্রতিরোধক ক্ষমতা ক্রমে কমে এলে। মৃত্যুভয়ের খুব সাধারণ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে রুগ্ন স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, উপযুক্ত পেশা না পাওয়া, ভালোবাসার বদলে হতাশা, উন্মাদনা, ধর্মীয় মৌলবাদ ইত্যাদি।

বুড়ো মানুষদের দুশ্চিন্তা

ভয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দুশ্চিন্তা হলো একটি মানসিক অবস্থা। এটি ধীরে তবে স্থিরভাবে কাজ করে। এটি অনিষ্টকর এবং সূক্ষ্ম। এটি পদক্ষেপ ফেলে ফেলে মানুষের মনে ঢুকে পড়ে এবং একজনের ব্যাখ্যাবুদ্ধি নষ্ট করে দেয়, ধ্বংস করে আত্মবিশ্বাস ও উদ্যম। দুশ্চিন্তা হলো শক্তিপ্রদ ভয়ের একটি কাঠামো যা সিদ্ধান্তহীনতার কারণে গড়ে ওঠে। তবে এ মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বেশিরভাগ মানুষেরই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার মতো ইচ্ছাশক্তি নেই।

আমেরিকার অর্থনৈতিক মহামন্দার সময় বিশ্বজুড়ে গোটা আবহ আক্রান্ত হয়েছিল দুটি মানসিক রোগ দ্বারা 'Farenza' এবং 'Worryitis'। ১৯২৯ সালে ওয়াল স্ট্রিটের পতনের পরে এই রোগ দুটির জীবাণু সকলকে আক্রান্ত করে। সে জীবাণুর প্রতিষেধক ছিল একটিই আর তা হলো **সুদৃঢ় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ**। এই টোটকাটি যে কোনো মানুষই নিজের জন্য প্রয়োগ করতে পারে।

একবার আমি এক লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। যাকে ঘণ্টা দুই পরে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে হত্যা করা হবে। কনডেম-সেলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আটজন আসামীর মধ্যে তাকে সবচেয়ে শান্ত লাগছিল। তার নিরুদ্বেগ ভাব দেখে আমি তার কাছে জানতে চাই কিছুক্ষণ পরেই সে অনন্ত যাত্রা করবে, এ মুহূর্তে তার কেমন লাগছে। সে মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি এনে জবাব দেয়, 'বেশ লাগছে। একবার ভাবুন, ভাই, আমার সমস্ত ঝামেলা শীঘ্রি মিটে যাবে। সারাটা জীবন তো ঝমেলা আর দুঃখ-কষ্ট ছাড়া কিছুই পেলাম না। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার আর পরনের পোশাক জোগাড় করতেও ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত প্রাণ। আর কিছুক্ষণ বাদে এগুলোর আমার আর প্রয়োজন হবে না। যখন জানলাম মৃত্যু আমার সুনিশ্চিত তারপর থেকেই মনে শান্তি পাচ্ছি। আমি আমার মনকে তৈরি করে ফেলেছি যে আনন্দিত চিত্তে বরণ করব মৃত্যু।'

কথা বলতে বলতে সে তিনজনের সমান খাবার একাই সাবাড় করছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার জন্যে কোনো বিপর্যয় অপেক্ষা করে নেই।

সিদ্ধান্ত এই মানুষটিকে নিয়তির কাছে সমর্পণ করেছে। সিদ্ধান্তের সাহায্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানো যায়। সিদ্ধান্তহীনতার কারণেই ভয়ের ছয়টি মূল রূপান্তরিত হয়ে দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়। মৃত্যু অনিবার্য একে মেনে নিতেই হবে, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত করুন, মৃত্যুভয় থেকে চির জীবনের জন্য মুক্ত হয়ে যান। দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন ছাড়াই যে সম্পদ অর্জন করতে পারবেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবেন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে চাবকে দিন দারিদ্র্যের ভয়কে। অন্য লোকে আপনাকে নিয়ে কী বলল বা ভাবল তাতে আপনার কিছু আসে যায় না, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে সমালোচনার ভয়কে দূর করুন। বুড়ো বয়সকে অভিশাপ নয় আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বুড়িয়ে যাওয়ার ভয়কে বিদায় জানান। ভাবুন বয়স যত বাড়বে ততই আপনার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে, নিজেকে আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

ভগ্ন স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলো ভুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রুগ্নতার ভয় থেকে মুক্তি লাভ করুন। ভালবাসা বা প্রেম না পেলেও আপনি একা দিব্যি চলতে পারবেন এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালোবাসা হারানোর ভয় থেকে বেরিয়ে আসুন।

দুশ্চিন্তার অভ্যাস পরিত্যাগ করুন। জীবন আপনাকে যা দিচ্ছে সেখানে দুশ্চিন্তা অর্থহীন, এ সিদ্ধান্ত নিন। দেখবেন তাহলে আপনার মধ্যে চলে এসেছে মানসিক স্থৈর্য, শান্তি এবং চিন্তার স্থিরতা যা আপনার জন্য নিয়ে আসবে সুখ।

একজন মানুষ, যার মন সবসময় ভয়ে পূর্ণ থাকে সে শুধু তার বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলো করার সুযোগই হারায় না এবং তার সান্নিধ্যে যারা আসে তাদের সকলের মধ্যে এই ধ্বংসাত্মক কম্পনটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাদের সমস্ত সুযোগও নষ্ট করে দেয়।

এমনকী একটি কুকুর কিংবা ঘোড়াও বুঝতে পারে কখন তার মনিবের মনে সাহসের অভাব ঘটেছে। শুধু তাই নয় তার ভেতরে প্রভুর ভয়ের কম্পনটি ঢুকে যায় এবং সে-ও ওইরকম আচরণ করতে থাকে। মৌমাছি মানুষকে কামড়ে দেয় যখন সে ভয় পায়। মানুষের ভয়ের কম্পন প্রভাবিত করে মৌমাছিকে, তখন সে দংশন করে।

একটি রেডিও স্টেশন থেকে মানুষের কণ্ঠ যেমন আরেকটি রেডিওর রিসিভিং সেটে প্রবেশ করে ঠিক একইভাবে ভয়ের কাঁপন একজনের মন থেকে আরেকজনের মনে একইভাবে ঢোকে। যে মানুষ ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির চিন্তা ভাবনা রিলিজ করে সেটি অপরের সৃজনশীল কল্পনাগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে। অন্য

মানুষটির অবচেতন মনে ওই ধ্বংসাত্মক চিন্তা ঢুকে গিয়ে সেটি তার চরিত্রের একটি অংশ হয়ে ওঠে।

একজন একটি চিন্তা ছেড়ে দিলেই তা খতম হয়ে গেল না। যখন একটি চিন্তা মন থেকে ছাড়া পায় সেটি চতুর্দিকে পড়ে ইথার বা বাতাসের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। এটি যে লোক চিন্তাটি ছড়িয়ে দিচ্ছে তার অবচেতন মনে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসে।

আপনার জীবনের উদ্দেশ্য হলো সাফল্য অর্জন। সাফল্য পেতে হলে আপনার থাকতে হবে মনের শান্তি, অর্জন করতে হবে জীবনের জাগতিক সব প্রয়োজন এবং সবার ওপরে সুখ। সাফল্যের এ সমস্ত এভিডেন্স চিন্তার আবেগের গঠন থেকে শুরু হয়।

আপনি চাইলেই আপনার মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। আপনি যেমন ইচ্ছা চিন্তা আপনার মনে ঢোকাতে পারবেন। তবে এটি ব্যবহার করতে হবে গঠনমূলকভাবে। আপনিই আপনার নিয়তির প্রভু যদি আপনি নিজের চিন্তা ভাবনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন। আপনি ইচ্ছা করলে আপনার নিজস্ব পরিবেশকে প্রভাবিত, পরিচালিত এবং সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, জীবনকে যেভাবে চান সেভাবে গড়ে তুলতে পারবেন। আবার জীবনের সুযোগগুলো অবহেলা করে নিজেকে 'পরিবেশের' বিশাল সমুদ্রেও নিক্ষেপ করতে পারবেন যেখানে মহাসারের ঢেউয়ে খড়কুটোর মতোই ভেসে যাবেন।

শয়তানের কর্মশালা

সপ্তম মৌলিক ভয়

ছয়টি মৌলিক ভয়ের সঙ্গে যোগ করা হলো আরেকটি ভয় যেটির কারণে ভুক্তভোগী হতে হয় মানুষকে। এটি উর্বর মাটিতে স্থাপিত হয়ে ব্যর্থতার বীজের মাঝে দ্রুত গড়ে ওঠে। এটি এতটাই সূক্ষ্ম যে প্রায়ই এর উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। **এটি অন্য ছয়টি ভয়ের চেয়েও ভয়ংকর। এর নাম নেতিবাচক প্রভাব।**

যারা ধনবান এবং ঐশ্বর্যশালী হন তাঁরা সবসময় এ মন্দ প্রভাবটি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলেন। দারিদ্র্যপীড়িত মানুষজন কখনো তা করে না। যারা সফল হতে চায় তাদের মনকে অবশ্যই এই শয়তানকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। আপনি যদি সমৃদ্ধশালী হওয়ার জন্য এ লেখাটি পড়ে থাকেন তাহলে অত্যন্ত সাবধানে নিজেকে পরীক্ষা করবেন, সিদ্ধান্ত নেবেন এই নেতিবাচক প্রভাবগুলোর দ্বারা আপনি সহজেই প্রভাবিত হতে পারেন কিনা? আত্ম-বিশ্লেষণের এ বিষয়টি যদি অগ্রাহ্য করেন, আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণের অধিকার আপনি খোয়াবেন।

বিশ্লেষণগুলো করুন। আত্ম বিশ্লেষণের যে প্রশ্নগুলো দেয়া হলো তা পাঠ করার পরে এর সঠিক জবাব দিতে প্রস্তুত হোন। সযত্নে লেখাটি পড়ুন এবং দেখুন এমন কোনো শত্রুর সন্ধান মেলে কিনা যে ঘাপটি মেরে আছে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, আপনার নিজের দোষগুলো খুঁজে বের করে ওই দৃশ্যমান শত্রুর মোকাবিলা করুন। রাস্তায় ডাকাতদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবেন কারণ সেখানে পুলিশ আছে কিন্তু ‘সপ্তম বেসিক শয়তান’টির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করা বেশ কঠিন কারণ এটি তখন আপনাকে আত্মস্থ করবে যখন এর বিষয়ে সচেতন থাকবেন না। সেটা আপনি জেগে থাকুন কিংবা ঘুমিয়ে থাকুন যা খুশি। এর অস্ত্রগুলোও দেখা যায় না, কারণ এটি মানসিক অবস্থা দিয়ে গঠিত নয়। এ শয়তানটি বিপজ্জনক কারণ এটি বিভিন্ন আকার নিয়ে হামলা চালায় মানুষের নানান অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে।

নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে কীভাবে রক্ষা করবেন নিজেকে

নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে স্বীকার করুন আপনার একটি ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। এবং এর ক্রমাগত ব্যবহার চালিয়ে যান যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি আপনার নিজের মনের নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

জেনে নিন যে আপনিসহ সকল মানুষই প্রকৃতিগতভাবে অলস, উদাসীন এবং সকল পরামর্শের বিষয়ে সন্দেহপ্রবণ যা আপনার দুর্বলতাকে সমন্বয় করে।

জেনে নিন, প্রকৃতিগতভাবেই আপনি সকল ছয়টি ভয় দ্বারা প্রভাবিত এবং ভয়গুলো করতে অভ্যাস গড়ে তুলবেন।

জেনে নিন, নেতিবাচক প্রভাবগুলো প্রায়ই আপনার অবচেতন মনের মধ্যে কাজ করে এবং এগুলো চিহ্নিত করা কঠিন এবং আপনি ওইসব লোকদের জন্য মনের দ্বার বন্ধ করে রাখবেন যারা আপনাকে নিরুৎসাহিত এবং হতাশ করে তোলে।

আপনার মেডিসিন চেস্ট খুলে সকল ওষুধের বোতল ফেলে দিন এবং সর্দি, কাশি, ঠাণ্ডা, মাথাব্যথাসহ কাল্পনিক অসুখ-বিসুখে উৎসাহ প্রদান বন্ধ করুন।

সেইসব লোকের সঙ্গে চলাফেরা করবেন যারা আপনাকে ভাবতে এবং নিজের মতো কাজ করতে প্রভাবিত করবে।

নেতিবাচক প্রভাবের দুর্বলতাটি খুবই ক্ষতিকর। কারণ বেশিরভাগ মানুষ জানে না তারা এই অভিশাপটি বহন করছে এবং জানতেও পারছে না তারা এটিকে অবহেলা বা অগ্রাহ্য করছে আর সেই ফাঁকে এটি তাদের দৈনন্দিন রুটিনের অনিয়ন্ত্রিত অংশ হয়ে উঠছে।

যারা নিজেদেরকে জানতে চায় এবং চিনতে চায় বিশেষ করে তাদের জন্যেই এই প্রশ্নগুলো তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্নগুলো পড়বেন এবং জোরে জোরে জবাব দেবেন, যাতে নিজের কণ্ঠ শুনতে পান। এতে নিজের কাছে আপনি সৎ থাকতে পারবেন।

আত্মবিশ্লেষণ পরীক্ষার প্রশ্ন

* আপনি কি প্রায়ই অনুযোগ করেন যে কিছুই ভাল্লাগে না এবং যদি অভিযোগ করেই থাকেন কারণটি কী? সামান্যতম উস্কানিতেই কি আপনি অন্য লোকের মধ্যে দোষ খুঁজে পান?
* আপনি কি প্রায়ই আপনার কাজে ভুল করেন? করে থাকলে কেন? আপনি কি কথা বলা রসময় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন এবং মারমুখি হয়ে থাকেন?
* আপনি কি লোকের সঙ্গ এড়িয়ে চলেন? চললে কেন? আপনার কি প্রায়ই হজমে গোলমাল হয়? হলে কারণ কী?
* জীবন কি আপনার কাছে ব্যর্থ এবং ভবিষ্যত অনর্থক মনে হয়? যদি মনে হয়, কেন?
* আপনি কি আপনার পেশা পছন্দ করেন? করলে কেন?
* প্রায়ই কি নিজেকে অসহায় মনে হয়? যারা আপনাকে ছাড়িয়ে যায় তাদেরকে কি ঈর্ষা করেন?
* আপনি আপনার সময় কী ভেবে বেশিক্ষণ কাটান ব্যর্থতার কথা ভেবে না সাফল্যের কথা? বয়স যত বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনার মনে হচ্ছে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে নাকি কমছে?
* ভুল থেকে কি আপনি শিক্ষা নেন?
* আত্মীয়-স্বজন বা চেনা পরিচিতরা আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে কি তা মেনে নেন? নিলে কেন?
* আপনার ওপর কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি? কারণ কী?
* নেতিবাচক বা নিরুৎসাহকর ঘটনা কি এড়িয়ে চলতে পারেন? ব্যক্তিগতভাবে কি আপনি উদাসীন? যদি তাই হয় কেন এবং কখন উদাস থাকেন?
* কাজের মাঝে ব্যস্ত থেকে ঝামেলা ভুলে যেতে কি শিখেছেন?
* আপনি নিজেকে ‘মেরুদণ্ডহীন প্রাণী বলবেন যদি অন্যরা আপনার সম্পর্কে এরকম ধারণাই পোষণ করে থাকে?
* আপনাকে কী ধরনের বিষয় বিরক্ত করে থাকে এবং আপনি ওগুলো সহ্যই

বা করেন কেন? 'নার্ভ শান্ত রাখতে' কি আপনি মদ পান, ধূমপান কিংবা মাদক সেবন করেন? যদি করে থাকেন তাহলে কেন এর পরিবর্তে নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করছেন না?

* কেউ কি আপনাকে খোঁচাখুঁচি করে? করলে কী তার কারণ?
* আপনার কি সুনির্দিষ্ট প্রধান কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে? থাকলে সেটি কী এবং এটি অর্জনের জন্য আপনার পরিকল্পনা কী?
* আপনি কী ছয়টি মৌলিক ভয়ের কোনো একটি দ্বারা তাড়িত? যদি তাই হয় তবে কোন্ ভয়টি?
* অন্যদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে বা আড়াল করতে কোনো কলাকৌশল জানা আছে কি আপনার?
* আপনি আপনার মনকে ইতিবাচক করে তুলতে কি অটো-সাজেশন ব্যবহার করেন? কোন্ বিষয়টিকে আপনি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন—বস্তুগত সম্পদ নাকি নিজের চিন্তা ভাবনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা?
* আপনার নিজের বিচার বুদ্ধি কি অন্যদের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়?
* আপনি কি আপনার সমস্ত ভুল এবং ব্যর্থতাগুলো বিশ্লেষণ করে এগুলোর দ্বারা লাভবান হওয়ার চেষ্টা করেন নাকি ভাবেন এসব আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না?
* আপনি কি আপনার সবচেয়ে ক্ষতিকর তিনটি দুর্বলতার কথা বলতে পারবেন? এগুলো শোধরানোর জন্য কী করছেন?
* প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কি শিক্ষা নেন যা আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে?
* আপনি অন্যদের দুঃখের ভাগীদার হন?
* আপনার উপস্থিতি কি অন্যদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে? অন্য লোকদের কী কী বিষয় আপনাকে সবচেয়ে বিরক্ত করে?
* আপনি কি নিজের মতামতে চলেন নাকি অন্যদের দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত হতে দেন?
* আপনি কি শিখেছেন যে মানসিক এমন অবস্থা তৈরি করা যাতে সকল নিরুৎসাহব্যঞ্জক প্রভাব থেকে নিজেকে আড়াল করা যায়?
* আপনার পেশা কি আপনাকে বিশ্বাস এবং আশা দিয়ে অনুপ্রাণিত করে?
* আপনি কি এ বিষয়ে সচেতন যে আপনার যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে

যার সাহায্যে ভয়ের সকল আকার-আকৃতিকে মন থেকে দূর করা যায়?

* আপনার ধর্ম কি আপনার নিজের মনকে ইতিবাচক রাখতে সাহায্য করে?
* আপনি কি মনে করেন অন্যের দুঃখকষ্টে আপনার এগিয়ে যাওয়া উচিত? যদি ভেবে থাকেন, তবে কেন?
* আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে মিশে কি এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন যে সব শিয়ালের এক রা?
* যে লোকগুলোর সঙ্গে আপনি সবচেয়ে বেশি মেলামেশা করেন তাদের সঙ্গে কী রকম যোগাযোগ অনুভব করেন এবং তাদের কারণে কি কখনো অসুখী হয়েছেন?
* এরকম কি হতে পারে যে, যে মানুষটিকে আপনি আপনার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাবলেন অথচ বাস্তবে সে-ই আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে গেল আপনার ওপর তার নেতিবাচক প্রভাবের কারণে?
* আপনি কীভাবে বিচার করেন যে কে আপনার জন্য সবচেয়ে উপকারী আর কে ক্ষতিকর? আপনার সঙ্গী সাথীরা মানসিকভাবে আপনার কাছে সুপিরিয়র নাকি ইনফেরিওর মনে হয়?
* আপনি প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা সময়ে সবচেয়ে বেশি কী কাজে ব্যয় করেন?

ক. নিজের পেশাগত কাজে, খ. ঘুমিয়ে, গ. খেলাধুলা কিংবা আরাম করে, ঘ. জ্ঞানার্জন করে, ঙ. বেহুদাই সময় নষ্ট করে।

* আপনার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি–

ক. আপনাকে উৎসাহিত করে

খ. আপনাকে সতর্ক করে

গ. আপনাকে হতাশ করে

ঘ. আপনাকে নানাভাবে সাহায্য করে

* আপনি সবচেয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন কী নিয়ে? আপনি এটি সহ্য করছেন কেন?
* আপনাকে যখন কেউ অযাচিত উপদেশ দেয় আপনি কি বিনা প্রশ্নেই তা মেনে নেন নাকি তাদের মনোভাব যাচাই করেন?
* আপনি সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা করেন কী? আপনার কি এটি অর্জন করতে ইচ্ছে হয়? আপনি এই আকাঙ্ক্ষার কাছে অন্যসব কিছু জলাঞ্জলি দিতে পারবেন?

* আপনি এটি অর্জনের জন্য প্রতিদিন কতটা সময় ব্যয় করেন? আপনি কি প্রায়ই আপনার মত বদলান? যদি করে থাকেন তো কেন?
* আপনি যা একবার শুরু করেন তা কি সাধারণত শেষ করেন?
* আপনি অন্য লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা, কলেজ ডিগ্রি কিংবা ধনসম্পদ দেখে সহজেই মোহিত হয়ে যান?
* অন্যরা আপনার সম্পর্কে কী বলল তাকে কি আপনি সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়েন? লোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী কি তাদের মনোরঞ্জন করেন? জীবিত কোন মানুষটিকে সবচেয়ে সেরা বলে মনে হয়? এ মানুষটি কোন্ কোন্ দিক দিয়ে আপনার থেকে সেরা?
* আপনি এ প্রশ্নগুলো পাঠ এবং জবাব দানে কতটা সময় ব্যয় করেছেন? (বিশ্লেষণের এবং গোটা তালিকার প্রশ্নের জবাব দিতে কমপক্ষে একদিন সময় তো লাগারই কথা)।

এই প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিলে আপনি নিজেকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি চিনতে পারবেন। প্রশ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, প্রতি সপ্তাহে একবার করে কয়েকমাস ধরে পড়বেন এবং অবাক হয়ে যাবেন দেখে আপনার জ্ঞানের পরিধি কতটা বেড়ে গেছে। কিছু প্রশ্নের উত্তর নিজে দিতে না পারলে আপনাকে ভালো চেনে বা বুঝতে পারে, এমন কারো পরামর্শ নিন। এ অভিজ্ঞতাটিও হবে চমৎকার।

আপনি নিজের মনের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আনতে পারবেন। নিজের মনকেই যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, অন্য কোনো কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। আর নেতিবাচক চিন্তাভাবনা করে এমন লোকদের সঙ্গ এড়িয়ে চলবেন। এরা পদে পদে আপনাকে বাধা দেবে, কাজে নিরুৎসাহিত করবে।

টমাস আলভা এডিসনকে নেতিবাচক চিন্তার অধিকারীরা বাধা দিয়ে বলেছিল তিনি নাকি কোনোদিন এমন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারবেন না যা মানুষের কণ্ঠ রেকর্ড করতে পারে। এডিসন এদের কথা বিশ্বাস করেননি বলেই টেপ রেকর্ডার আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

নেতিবাচক মনোভাবের লোকেরা এফ. ডব্লু উলসওয়ার্থকে মানা করেছিল তিনি যেন পাঁচ এবং দশ সেন্ট মূল্যের জিনিসপত্র বিক্রয়ের দোকান না খোলেন, তাহলে ফ্লপ খাবেন। উলসওয়ার্থ জানতেন যুক্তিযুক্তভাবে সবকিছুই করা সম্ভব

যদি তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। অন্য লোকদের নেতিবাচক পরামর্শ মন থেকে দূর করে দিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বলেই পরবর্তীতে কয়েকশো মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে পেরেছেন।

নেতিবাচক মনের মানুষরা জর্জ ওয়াশিংটনকে বলেছিল তিনি ব্রিটিশদের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকতে পারবেন না। কিন্তু ওয়াশিংটনের মনে বিশ্বাস ছিল এবং তাঁর সেই বিশ্বাসের জয়ও হয়েছে।

হেনরি ফোর্ড ডেট্রয়েটের রাস্তায় গাড়ি নামানোর কথা বললে অনেকেই তাঁকে নিরুৎসাহিত করেছে। বলেছে লোকে এই অদ্ভুত চেহারার যন্ত্রটি কখনো পয়সা দিয়ে কিনবেন না।

ফোর্ড বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবী বেঁধে দেব মোটর গাড়ি দিয়ে।' শেষতক তিনি তা-ই করেছিলেন। নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর বিশ্বাস তাঁকে এতটাই সম্পদশালী করে তোলে যে তার বংশধরদের পাঁচ প্রজন্ম বসে খেলেও ফুরাবে না। লোকে ফোর্ড সম্পর্কে বলত **ফোর্ডের একটি মন আছে এবং তিনি সেটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। অন্যদের মন থাকলেও তারা তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে না।**

হেনরি ফোর্ডের কথা বারবারই বলা হচ্ছে কারণ তিনি সেই রকম একজন মানুষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ যার মন আছে এবং তিনি তা নিয়ন্ত্রণ করে যা চান সেটাই পেতে পারেন। তাঁকে কেউ কিছু হাতে তুলে দেয়নি। সব তিনি নিজের হাতে গড়েছেন।

সেলফ-ডিসিপ্লিন এবং অভ্যাসের ফল হলো মন নিয়ন্ত্রণ। হয় আপনি মনকে নিয়ন্ত্রণ করবেন নতুবা সেটি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এর মধ্যে সমঝোতার কোনো বিষয় নেই। মন নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বাস্তব পদ্ধতি হলো, একে সবসময় নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা ব্যস্ত রাখা এবং সে উদ্দেশ্যের পেছনে অবশ্যই একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে। যে কোনো সফল মানুষের জীবন ইতিহাস জানুন দেখবেন তিনি নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন, তাছাড়া তিনি এ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একে পরিচালিত করেছেন নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

বাহানা

যারা সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয় তাদের মধ্যে একটি বিষয়ে বেশ মিল থাকে। তারা তাদের ব্যর্থতার কারণ জানে। তবে কেন সফল হতে পারল না তার জন্য নানান বাহানা তৈরি করে রাখে। এর মধ্যে কিছু বাহানা স্রেফ বাহানাই আবার কিছুর পেছনে যুক্তি আছে।

একজন ক্যারেক্টার অ্যানালিস্ট সর্বাধিক ব্যবহৃত বাহানার একটি তালিকা করেছেন। আপনি তালিকাটি পড়ুন, নিজেকে সাবধানে যাচাই করুন এবং দেখুন এর মধ্যে কতগুলো বাহানা আপনার নিজেরই রয়েছে।

আমার যদি সংসার করতে না হতো... যদি টাকা থাকত... আমার যদি উচ্চ শিক্ষা থাকত... আমি যদি একটি চাকরি পেতাম... আমি যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতাম...আমার হাতে যদি সময় থাকত... সময়টা যদি ভাল যেত... যদি লোকে আমাকে বুঝত... আমার পরিবেশ-পরিস্থিতি যদি অন্যরকম হতো... যদি আমার জীবনটা নতুনভাবে শুরু করতে পারতাম... লোকে কী বলে সেই ভয় যদি মনের মধ্যে কাজ না করত... আমাকে যদি কোনো সুযোগ দেয়া হতো... আমি যদি এখন একটা সুযোগ পেতাম... যদি আমার বয়েসটা আরেকটু কম হতো... আমি যা চাই যদি শুধু সেই কাজটাই করতে পারতাম... যদি জন্মসূত্রেই ধনী হতে পারতাম... যদি সঠিক মানুষগুলোর সঙ্গে পরিচয় হতো,.. অন্য লোকের মতো যদি প্রতিভা থাকত আমার... যদি অতীতের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারতাম... যদি বাড়িভাড়া দিতে না হতো আর বাচ্চাকাচ্চার পেছনে ব্যয় করতে না হতো... যদি কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারতাম... বস যদি শুধু আমার একটু প্রশংসা করতেন... আমাকে সাহায্য করার মতো যদি কেউ থাকত... আমার পরিবার যদি আমাকে বুঝতে পারত... যদি বড় একটি শহরে বাস করতে পারতাম... যদি শুধু শুরুটা করে দিতে পারতাম... শুধু যদি ফ্রি থাকতে পারতাম... যদি আমার অন্য লোকদের মতো ব্যক্তিত্ব থাকত... আমি যদি এত মোটা না হতাম... আমার প্রতিভার কথা যদি লোকে জানতে পারত... যদি স্রেফ একটা 'ব্রেক' পেতাম... যদি ঋণের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম...

যদি ব্যর্থ না হতাম... যদি জানতাম কীভাবে... যদি সবাই আমার বিরুদ্ধাচারণ না করত... যদি মনের মধ্যে এত দুশ্চিন্তা না থাকত... যদি সঠিক মানুষটির সঙ্গে বিয়ে হতো... লোকজন যদি এত ভোঁতা না হতো... আমার পরিবারের মানুষজন যদি এত একগুঁয়ে না হতো,.. যদি নিজের ওপর ভরসা করা যেত... যদি ভাগ্য আমার প্রতি বিরূপ না হতো... আমার যদি ভুল পরিবারে জন্ম না হতো... যদি এ পরিশ্রম করতে না হতো... যদি টাকাগুলো না খোয়াতাম... যদি অন্যরকম পড়শী পেতাম... যদি 'অতীত' ভুলে যেতে পারতাম... যদি নিজের কোনো ব্যবসা থাকত... যদি অন্য লোকে আমার কথা শুনত... আর যদি এ সাহসটাই থাকত যে নিজেকে দেখার যে আসলে আমি কী, আমার ভুলগুলো কী এবং সেগুলো শোধরাতে পারতাম তাহলে হয়তো ভুল থেকে শিক্ষা নিতাম এবং অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিখতাম। কারণ আমি জানি আমার কিছু সমস্যা আছে নইলে আজ সেখানেই থাকতাম যেখানে আমার থাকার কথা ছিল এবং দুর্বলতাগুলো বিশ্লেষণ না করে সেগুলো এড়িয়ে যেতে বাহানা না করলে আজ আমার দশা এরকম হতো না।

বাহানা বা ছুতো তৈরির এ অভ্যাস চিরকালীন এবং এটি সাফল্য অর্জনের পথে বিরাট অন্তরায়। লোকে কেন এমন ছুতো নিয়ে পড়ে থাকে? এর জবাব পরিষ্কার। তারা তাদের বাহানা বা ছুতোগুলোর পক্ষে সাফাই গায় কারণ এগুলো তাদের সৃষ্টি।

বাহানা গেঁথে থাকে অভ্যাসের গভীরে। আর অভ্যাস ভাঙা বড়ই কঠিন কাজ বিশেষ করে সেগুলো যখন কোনো কাজের জন্য অজুহাত দেয়া হয়। প্লেটো এ জন্যেই বলেছিলেন, 'প্রথম এবং সেরা বিজয় হলো নিজেকে জয় করা। নিজেকে জয়ের বদলে নিজের কাছে পরাজয় অত্যন্ত লজ্জার এবং ঘৃণার।'

আরেকজন দার্শনিকও একই চিন্তা ব্যক্ত করে বলেছেন, 'আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম দেখে যে অন্যদের যেসব কুৎসিত রূপ আবিষ্কার করেছি তার সবই আসলে আমার প্রকৃতির প্রতিফলন মাত্র।'

'বিষয়টি সবসময়ই আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়,' বলেছেন এলবার্ট হাবার্ড, 'কেন লোকে তাদের দুর্বলতা ঢাকতে সময় নষ্ট করে ছুতো তৈরি করে। যদি অন্যভাবে ব্যবহার করা যেত, সেই একই সময় দুর্বলতা কাটানোর জন্য যথেষ্টই হতো, কোনো বাহানা সৃষ্টির প্রয়োজন হতো না।'

বিদায় নেয়ার আগে আপনাদেরকে একটি কথা বলে যেতে চাই, 'জীবন একটি দাবা খেলা এবং আপনার প্রতিযোগীটি **হচ্ছে সময়**। আপনি যদি নড়াচড়া করতে ইতস্তত করেন, **দ্রুত** এগোতে দ্বিধা করেন, আপনার লোক সময় দ্বারা দাবা বোর্ড থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আপনি এমন একজন পার্টনারকে নিয়ে খেলছেন যে **সিদ্ধান্তহীনতা** মোটেই সহ্য করবে না।'

যত বাহানা আছে সব বাদ দিন। আপনার হাতে এখন জীবনের অসামান্য সমৃদ্ধির জগতে প্রবেশ করার মাস্টার কী। এটি ছোঁয়া যায় না, তবে এ খুব শক্তিশালী! এ আপনার মানে ধনী হওয়ার বিরাট আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারবে। এটি ব্যবহার না করলে তার ফল আপনাকেই ভোগ করতে হবে। আর সেই ফলটি হলো ব্যর্থতা। আর মাস্টার কীটি সঠিকভাবে ব্যবহার করুন, আপনার জন্য অপেক্ষা করছে বিপুল পুরস্কার।

যা কিছু অভিজ্ঞতার গল্প

কংগ্রেস সদস্যের চিঠি

পনের বছর আগে আমি ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার সালেম কলেজে ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি এতটা আবেগে ভাষণ প্রদান করি যে গ্রাজুয়েশন ক্লাসের এক ছাত্রের মনে ওটা এমনই দাগ কেটে যায় যে সে ওটিকে নিজের জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করে। এই তরুণটি বর্তমানে কংগ্রেস সদস্য এবং বর্তমান প্রশাসনের এক হোমড়া চোমড়া ব্যক্তিত্ব। এই বইটি প্রকাশকের কাছে যাওয়ার ঠিক আগে আগে সে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল যাতে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার সমস্ত মতামত অকপটে প্রকাশ করেছিল। আমি সিদ্ধান্ত নিই তার এ চিঠি আমি এ বইতে যোগ করব। চিঠিটা পড়ুন। আপনার উপকারই হবে।

প্রিয় নেপোলিয়ন,

কংগ্রেস সদস্য হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমি নারী-পুরুষদের সমস্যার ভেতরের দিকগুলো দেখেছি। আমি এ বিষয়ে একটি সাজেশন দিতে চাই যা মানুষের উপকারে আসতে পারে।

১৯২২ সালে আপনি সালেম কলেজের ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি তখন গ্রাজুয়েশন ক্লাসের ছাত্র। ওই বক্তৃতায় আপনি আমার মনে এমন একটি আইডিয়া ঢুকিয়ে দেন যা কাজে লাগিয়ে আমি আমার দেশের মানুষের সেবা করতে পারি। আর ভবিষ্যতে আমি যেটুকু সাফল্যই অর্জন করি না কেন সব কিছুর পেছনে কৃতিত্ব দেব আমি এই আইডিয়াটিকে।

আমার পরামর্শ হলো আপনি সালেম কলেজে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তার সারমর্মটুকু আপনার বইতে দিয়ে দেবেন। ফলে আমেরিকার জনগণ আপনি বহুবছর ধরে আমেরিকাকে গড়ে তুলবার পেছনে যে বিখ্যাত মানুষগুলোর অবদান রয়েছে তাঁদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক এবং অভিজ্ঞতার কথা জানতে পেরে যারপরনাই উপকৃত হবে।

আমার এখনও মনে আছে, যেন গতকালকের ঘটনা, হেনরি ফোর্ডের যে অসাধারণ বর্ণনা আপনি দিয়েছিলেন, তিনি পড়ালেখার তেমন সুযোগ পাননি, তাঁর হাতে কোনো টাকা-পয়সা ছিল না, প্রভাবশালী বন্ধু-বান্ধব ছিল না, তারপরও তিনি শিখরে আরোহন করতে পেরেছিলেন। আপনি আপনার বক্তৃতা শেষ করার আগেই আমি সিদ্ধান্ত নিই যত কষ্টই হোক না কেন আমি আমার নিজের জন্য একটি জায়গা করে নেব।

হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এ বছরের এবং আগামী বছর তাদের স্কুলের পড়াশোনা শেষ করবে। সকলেই বাস্তব উৎসাহের একটি মেসেজ খুঁজবে যা আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তারা জানতে চাইবে কোথায় যাবে, কী করবে, কীভাবে শুরু করবে জীবন। আপনি তাদেরকে বলতে পারবেন কারণ আপনি অসংখ্য মানুষের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেছেন।

যদি সম্ভব হয়, আমি আপনাকে পরামর্শ দেব, আপনি আপনার প্রতিটি বইতে আপনার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণের চার্টটি দিয়ে দেবেন তাতে বইটির ক্রেতা আত্ম-আবিষ্কারের একটি সুযোগ পাবেন যার ইঙ্গিত আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছিলাম অনেক বছর আগে।

এতে এ বইয়ের পাঠকরা তাদের দোষগুণের পক্ষপাতহীন একটি চিত্র পেয়ে যাবেন এবং তারা সাফল্য ও ব্যর্থতার পার্থক্যও অনুধাবন করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণে লাখ লাখ মানুষ এখন কীভাবে প্রত্যাবর্তন করবে সেই সমস্যায় ভুগছে। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এই উদগ্রীব মানুষগুলো আপনাকে তাদের সমস্যার কথা বলার জন্য স্বাগত জানাবে এবং সমাধানে আপনার পরামর্শও গ্রহণ করবে।

আমেরিকায় হাজার হাজার মানুষ আজ জানতে চায় তারা তাদের আইডিয়াকে কীভাবে অর্থে রূপান্তর ঘটাবে, সেইসব মানুষ যারা ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসবে, যাদের কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই এবং তারা তাদের লস কাটিয়ে উঠতে চায়। কেউ যদি তাদেরকে সাহায্য করতে পারে তো সে আপনি।

আপনি বইটি প্রকাশ করলে সবার আগে আমি এর ক্রেতা হবো, অবশ্যই তাতে আপনার অটোগ্রাফ থাকতে হবে। শুভেচ্ছা। একান্ত আপনার–

জেনিস র‍্যানডলফ

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল সে

ভিয়েনা কোর্ট অপেরার এক পরিচালক সঙ্গীতের কলাকৌশল বেশ ভালো জানতেন। তবে আকাঙ্ক্ষার শক্তি সম্পর্কে তাঁর তেমন কিছু জানা ছিল না। তিনি যদি ওই শক্তটি সম্পর্কে ভালো জানতেন, কোনো প্রতিভাকে সুযোগ না দিয়েই তাকে বাদ দিতেন না। অনেক বছর আগে, আমার এক ব্যবসায়ী সহযোগী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার অবস্থা গুরুতর হতে থাকে অবশেষে তাকে অপারেশনের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হুইল চেয়ারে করে তাকে অপারেটিং রুমে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি তার দিকে তাকাই। তাকে খুবই দুর্বল এবং রোগা লাগছিল। ভাবছিল এমন রোগা ভোগা মানুষ অপারেশনের ধকল আদৌ সইতে পারবে কিনা। ডাক্তারও বলে দিয়েছিলেন এ লোকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে সেটা ছিল একান্তই ডাক্তারের মতামত। ওটা রোগীর মতামত ছিল না। তাকে হুইল চেয়ারে নিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে আগে আমাকে সে অস্পষ্ট গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'দুশ্চিন্তা করবেন না, বস। আমি এখান থেকে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বেরিয়ে আসব।' নার্স আমার দিকে কেমন করুণার দৃষ্টিতে তাকাল। তবে রোগী ঠিকই সুস্থ হয়ে ফিরে এল। অপারেশন হওয়ার পর ডাক্তার বললেন, 'তার নিজের আকাঙ্ক্ষাই আসলে তাকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে বাঁচিয়ে এনেছে। মৃত্যুর সম্ভাবনাকে সে প্রত্যাখ্যান না করলে বাঁচতে পারত না।'

আমি আকাঙ্ক্ষার শক্তিতে বিশ্বাসী, যার সঙ্গে মিশে আছে বিশ্বাস। কারণ আমি দেখেছি এই শক্তিটি দরিদ্র মানুষকে সম্পদশালী করে দিয়েছে। আমি দেখেছি এই শক্তি মানুষের মধ্যে এমন এক মিডিয়াম হিসেবে কাজ করেছে যাতে সে নানাভাবে পরাজিত হওয়ার পরেও প্রত্যাবর্তন করেছে। আমি দেখেছি এ শক্তি আমার ছেলেকে স্বাভাবিক, সুখি, সফল একটি জীবন উপহার দিয়েছে যদিও প্রকৃতি তাকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল কর্ণবিহীন করে।

এই আকাঙ্ক্ষার জোরেই আমেরিকার মানুষ অর্থনৈতিক মহামন্দার কাল

কাটিয়ে উঠে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে। এ মন্দা কত মানুষকে যে পথের ফকির বানিয়ে দিয়েছিল! সম্পদ হারিয়ে তারা নিমজ্জিত হয়েছে প্রবল হতাশায়। তবে এদের মধ্যে যারা তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে বুকে ধারণ করতে পেরেছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে একদিন সম্পদশালী হবে, তারা নিজেদের পরিকল্পনাগুলোকে নিজের মতো করে সাজিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। আমার যে অসুস্থ বন্ধুটির গল্প এখানে বললাম সে-ও কিন্তু বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পেরেছিল। আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আবারও বলছি যারা জীবনে কিছু অর্জন করতে চান, তার প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, শুরুটা করুন প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

'মানসিক রসায়ন' এর কিছু অদ্ভুত এবং শক্তিশালী প্রিন্সিপাল, যাকে প্রকৃতি কখনো ফাঁস করে না, তাকে **প্রবল আকাঙ্ক্ষা**'র জালে জড়িয়ে রাখে যেটি 'অসম্ভব' বলে কোনো শব্দে বিশ্বাসী নয় এবং ব্যর্থতাকে সে বাস্তব বলে মেনেই নেয় না।

আমার যদি মিলিয়ন ডলার থাকত তাহলে আমি কী করতাম

এ গল্পটি সেই পুরানো প্রবাদকেই প্রমাণিত করেছে যে 'ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়।' এ গল্পটি আমাকে বলেছিলেন প্রয়াত শিক্ষাবিদ এবং ধর্মযাজক ফ্রাঙ্ক ডব্লু গুনসালাস। তিনি দক্ষিণ শিকাগোয় স্টকইয়ার্ড অঞ্চলে ধর্মপ্রচারণায় ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন।

ডা. গুনসালাস কলেজে পড়ার সময় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচুর গলদ দেখতে পান, যে গলদগুলো তাঁর বিশ্বাস তিনি কলেজ প্রধান হলে শুধরে দিতে পারতেন। তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হবেন যেখানে তরুণ-তরুণীরা 'কাজ থেকে শিখবে।'

তিনি সিদ্ধান্ত নেন একটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করবেন যেখানে নিজের আইডিয়াগুলো বহন করতে পারবেন শিক্ষার গোঁড়ামিপূর্ণ পদ্ধতিগুলো ছাড়াই।

প্রজেক্টটির বাস্তবায়নে তাঁর মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন ছিল। এত বিপুল অংকের অর্থ তিনি কীভাবে জোগাড় করবেন? উচ্চাকাঙ্ক্ষা তরুণ ধর্মযাজকের মনে এ প্রশ্নটিই সবচেয়ে বেশি ঘুরপাক খাচ্ছিল।

তবে তিনি তেমন এগোতে পারছিলেন না। প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় তিনি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতেন। এ চিন্তা নিয়ে ঘুম থেকে জাগতেন। যেখানে যেতেন সেখানেই এ চিন্তা তাঁর মনে ঘুরপাক খেত। তিনি এটি নিয়ে ভাবতে ভাবতে এক পর্যায়ে ভাবনাটি তাঁর অবসেশনে পরিণত হয়। এক মিলিয়ন ডলার

অনেকগুলো টাকা। তিনি এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন তবে সেই সঙ্গে এ সত্যটিও অনুধাবন করেন যে শুধু সীমাবদ্ধতাই এজন্য মানুষের মনের মধ্যে গেড়ে বসে।

একজন ধর্মযাজক এবং দার্শনিক হিসেবে ডা. গুনসালাস বুঝতে পারেন যারা জীবনে সফল হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই শুরুতে ছিল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। তিনি এও উপলব্ধি করেন উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা যখন দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয় তখন এর জাগতিক বাস্তবায়ন ঘটে।

তিনি এসব সত্য সবই জানতেন তবে জানতেন না কীভাবে এবং কোত্থেকে মিলিয়ন ডলার জোগাড় করবেন। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যে ব্যাপারটি ঘটতে পারত তা হলো একজন এ কথা বলে ইচ্ছেটা ত্যাগ করত, 'আমার আইডিয়াটি ভালো তবে আমি এটি দিয়ে কিছুই করতে পারব না কারণ আমি প্রয়োজনীয় মিলিয়ন ডলার জোগাড়রই করতে পারব না।' বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু ঠিক এ কথাগুলোই বলত কিন্তু গুনসালাস তা বলেননি। তিনি যা বলেছিলেন এবং যা করেছিলেন তা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর ভাষ্যে তুলে দিলাম।

শনিবারের এক বিকেলে আমি আমার ঘরে বসে চিন্তা করছিলাম কীভাবে টাকাটা তোলা যায়। প্রায় দুইবছর ধরে আমি কেবল চিন্তাই করে যাচ্ছিলাম, চিন্তা ছাড়া আর কিছুই করিনি।

অবশেষে কাজে নেমে পড়ার সময় এলো।

'আমি তখনি আমার মন স্থির করে ফেললাম যে এক সপ্তাহের মধ্যে এক মিলিয়ন ডলার জোগাড় করে ফেলব। কিন্তু কীভাবে? তা নিয়ে অবশ্য ভাবছিলাম না। আসল বিষয় ছিল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকাটা পেতে হবে এবং সত্যি বলছি যে মুহূর্তে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম এক সপ্তাহের মধ্যে টাকাটা জোগাড় করে ফেলব, আমার মধ্যে চলে এল এক অদ্ভুত আশ্বস্তবোধ, এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, 'এই সিদ্ধান্তটি আরো আগে নিলে না কেন? টাকাটা তোমার জন্য সবসময়ই অপেক্ষা করছিল।'

তারপর সবকিছু দ্রুত ঘটতে লাগল। আমি খবরের কাগজে ফোন করে বললাম পরদিন সকালে আমি একটি নসিহত দেব যার শিরোনাম 'আমার যদি এক মিলিয়ন ডলার থাকত তাহলে আমি কী করতাম?'

আমি ওই নসিহতটি তৈরির কাজে লেগে গেলাম এবং সত্যি বলতে কী

কাজটি তেমন কঠিন কিছু ছিল না কারণ গত প্রায় দুইবছর ধরে আমি ওই নসিহতটা তৈরি করছিলাম।

মাঝরাতের আগেই নসিহত লেখাটি শেষ হলো। আমি বিছানায় গিয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুমালাম কারণ আমি তখন দেখতে পাচ্ছিলাম মিলিয়ন ডলার পেয়ে গেছি।

পরদিন খুব ভোরে উঠে পড়লাম ঘুম থেকে, বাথরুমে গিয়ে নসিহতটি পড়লাম তারপর হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করলাম, আমার নসিহত যেন এমন কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে আমার প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে পারবে।

প্রার্থনার সময় আবারো সেই আশ্বস্ত হওয়ার অনুভূতিটি ফিরে এল মনের মাঝে যে আমি টাকা পাচ্ছি। উত্তেজনার চোটে লেখাটি না নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে এবং মঞ্চে উঠে ওটা পড়তে গিয়ে খেয়াল হলো জিনিসটি সঙ্গে নিয়ে আসিনি।

কাগজপত্র আবার নিয়ে আসার মতো অবস্থায় তখন ছিলাম না, তবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাকে ফিরে যেতেও হলো না! আমার অবচেতন মন সব কথা স্মরণ করিয়ে দিল। আমি চোখ বুজে সমস্ত আত্মা দিয়ে আমার নসিহত বয়ান করলাম দর্শক-শ্রোতাদের কাছে। আমি শুধু দর্শকদের সঙ্গেই কথা বলিনি, মনে হচ্ছিল স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছি। আমার হাতে এক মিলিয়ন ডলার এলে কী করব তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলাম। আমার পরিকল্পনাটি খুলে বললাম যে, একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার ইচ্ছা আছে আমার যেখানে তরুণ শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে সবকিছু শিখবে এবং একই সময় তাদের মানসিক উন্নয়নও ঘটবে।

আমি বক্তৃতা শেষ করে বসেছি, পেছনের সারি থেকে একজন তাঁর আসন থেকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, হেঁটে এগোলেন মঞ্চের দিকে। আমি বুঝতে পারছিলাম না লোকটির মতলব কী। তিনি মঞ্চবেদিতে এসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'রেভারেন্ড আপনার নসিহত আমার পছন্দ হয়েছে। আমার বিশ্বাস এক মিলিয়ন ডলার পেলে আপনি যা করতে চাইছেন তা করতে পারবেন। আমি যে আপনাকে বিশ্বাস করেছি এবং আপনার নসিহতের ওপর আস্থা রেখেছি তার প্রমাণ চাইলে কাল সকালে আমার অফিসে চলে আসুন। আমি আপনাকে এক মিলিয়ন ডলার দেব। আমার নাম ফিলিপ ডি. আর্মুর।

তরুণ গানসালাস মি. আর্মুরের অফিসে গিয়েছিলেন এবং এক মিলিয়ন ডলারও পেয়েছিলেন। ওই টাকা দিয়ে তিনি আরমুর ইনস্টিটিটিউট অব

টেকনোলজি গড়ে তোলেন।

এখানে একটি জিনিস খেয়াল করুন—তিনি নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছার ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে টাকাটা পেয়ে যান। টাকাটি পাবার জন্য তিনি একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও করেছিলেন।

তরুণ গানসালাসের এক মিলিয়ন ডলার চাইবার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তাঁর আগেও বহু মানুষ মিলিয়ন ডলার পাবার স্বপ্ন দেখেছে। তবে ডা. গানাসালাসের সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি দারুণ ব্যাপার ছিল। তিনি ওই শনিবার জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি ওই টাকাটি এক সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাব।'

যে মানুষ যদি জানে সে কী চায়, ঈশ্বর তার পক্ষে থাকেন যদি কিনা ওই লোকটি তার চাইবার জিনিসটি পাবার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে।

আপনি যদি সেই লোকদের কাতারভুক্ত হন যারা বিশ্বাস করে কঠিন পরিশ্রম এবং সততা থাকলেই ধনী হওয়া যায়, তাহলে বিশ্বাসটি ঝেড়ে ফেলে দিন। কারণ এ কথা সত্য নয়।

সম্পদ যখন প্রচুর পরিমাণে আসে তা কখনোই কঠিন পরিশ্রমের ফল নয়। সম্পদ বা অর্থ আসে নির্দিষ্ট দাবির মুখে, হঠাৎ করে তা ভাগ্যের জোরে নয়, আইডিয়া দিয়েই অ্যাকশনে নামা যায়। চতুর সেলসম্যানরা জানে যেখানে পণ্য বিক্রি করা যায় না সেখানে আইডিয়া বিক্রি করা যায়। সাধারণ সেলসম্যানরা এই জাদুটি জানে না বলেই তারা 'সাধারণ।'

এক প্রকাশকের বই বিক্রি হতো না তেমন। তিনি জানতেন অনেক পাঠক স্রেফ বইয়ের প্রচ্ছদ এবং টাইটেল দেখে বই কেনে, ভেতরে কী আছে খুলেও দেখে না। তিনি একটি অচল বইয়ের নাম বদলে দিয়ে সেটিকে বেস্টসেলারে পরিণত করেছিলেন। বইটির ভেতরের মাল-মশলা একটুও বদলানো হয়নি। তিনি বইয়ের প্রচ্ছদ ছিড়ে ফেলে সেখানে নতুন প্রচ্ছদ এবং টাইটেল লাগিয়েছিলেন। ব্যাস, বই সুপারহিট।

আইডিয়ার কোনো স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস বা মূল্য নেই। আইডিয়ার স্রষ্টারা তাঁদের নিজেদের মূল্য নির্ধারণ করেন। সাথে চালাক চতুর হলে তিনি তা পেয়েও যান। চলচ্চিত্র শিল্প চোখের পলকে অনেককে কোটিপতি বানিয়েছে। তাঁদের বেশিরভাগই আইডিয়া তৈরি করেননি তবে আইডিয়া চেনার ক্ষমতা তাঁদের ছিল।

স্বাধীনতা অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে মৃত্যু

সিদ্ধান্তের মূল্য নির্ভর করে ওগুলো বাস্তবায়নে যে সাহসের প্রয়োজন তার ওপর। যেসব বড় বড় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা সভ্যতার ভিত্তিমূল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে সেগুলো অর্জনে বিপুল ঝুঁকি নিতে হয়েছে, কখনো কখনো তা ডেকে এনেছে মৃত্যু।

তবে সর্বকালের সেরা সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করা হয় ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে ফিলাডেলফিয়াতে বসে যে ৫৬জন মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটিকে। তাঁরা জানতেন তাঁদের এ সিদ্ধান্ত হয় সকল আমেরিকানের জন্য স্বাধীনতা নিয়ে আসবে নতুবা তাঁদের প্রত্যেককে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হবে।

আমরা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের তারিখটির কথা স্মরণে রাখতে পারি। তবে খুব কম মানুষই বুঝতে পারি এ সিদ্ধান্ত নিতে কতটা সাহসের প্রয়োজন হয়েছিল।

আমরা বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ করি এবং আমেরিকার জনক হিসেবে জর্জ ওয়াশিংটনকে কল্পনা করি যে তিনিই আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন, তবে সত্য হলো এই ওয়াশিংটন ওই ঘটনার একজন সহযোগী ছিলেন মাত্র, লর্ড কর্নওয়ালিস আত্মসমর্পণ করার বহু আগেই তাঁর সেনাবাহিনী আমেরিকার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিল। তবে ওয়াশিংটনের গৌরব ক্ষুণ্ন করার অভিপ্রায়ে কিন্তু এ কথাগুলো বলা হয়নি। বরং যে আশ্চর্য ক্ষমতার বদলে তিনি স্বাধীনতা পেয়েছিলেন সেদিকেই বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। ঐতিহাসিকরা এ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করতে বেমালুম ভুলে গেছেন যা একটি জাতির জন্ম দিয়েছিল, তাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল।

এ ক্ষমতার জন্মের ঘটনাগুলোর ওপর একটু চোখ বুলানো যাক। গল্পের শুরু ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ, বোস্টনে। ব্রিটিশ সৈনিকরা তখন রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের চেহারা দেখে ভীত সাধারণ নাগরিক। কলোনিষ্টরা সশস্ত্র মানুষজন দেখে বেজায় ক্ষুব্ধ। তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ্যেই প্রকাশ করছিল সৈনিকদের উদ্দেশে পাথর ছুঁড়ে মেরে। শেষে কমান্ডিং অফিসার আদেশ দেয়,

বেয়োনেট তোলো... চার্জ করো।'

শুরু হয়ে যায় লড়াই। এতে বহু হতাহত হয়। এ ঘটনাটি এমনই ক্ষোভের সৃষ্টি করে যে প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলি (প্রখ্যাত কলোনিষ্টদের দ্বারা সৃষ্ট) অ্যাকশন গ্রহণের জন্য একটি মিটিং ডাকে। ওই অ্যাসেম্বলির দু'জন সদস্য ছিলেন জন হ্যানকক এবং স্যামুয়েল অ্যাডামস। তাঁরা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে কথা বলেন এবং ঘোষণা করেন বোস্টন থেকে সকল ব্রিটিশ সৈনিককে বিতাড়িত করা হবে।

অ্যাসেম্বলি স্থগিতের আগে স্যামুয়েল অ্যাডামসকে দায়িত্ব দেয়া হয় প্রভিন্সের গভর্নর হাচিনসনের সঙ্গে কথা বলার জন্য এবং তিনি ব্রিটিশ সৈনিকদেরকে বোস্টন থেকে চলে যাওয়ার দাবি জানান। তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা হয়। বোস্টন থেকে চলে যায় ব্রিটিশ সেনারা। তবে ঘটনার ওখানেই পরিসমাপ্তি নয়। এটি এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা গোটা সভ্যতাকে বদলে দেয়।

বোস্টনের সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের দুই বছর বাদে স্যামুয়েল অ্যাডামস প্রস্তাব রাখেন কলোনিগুলোর মধ্যে একটি করেসপন্ডেন্টস কমিটি গঠন করা হবে এবং প্রতিটি কলোনিতে একজন করেসপন্ডেন্ট থাকবেন। এই প্রস্তাব দেয়ার আগে অ্যাডামস ১৩টি কলোনির মধ্যে চিঠির আদান প্রদান করেছিলেন তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য। এ প্রস্তাবটি করা হয় 'ব্রিটিশ আমেরিকার কলোনিগুলোর উন্নয়নের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার উদ্দেশ্যে।

এ ঘটনাটি লক্ষ করুন! এটি ছিল সুদূর প্রসারিত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানের শুরু যা আপনাকে এবং আমাকে স্বাধীনতা এনে দেবে বলে নিয়তি নির্ধারিত ছিল। 'মাস্টার মাইন্ড' গঠিত হয়ে গিয়েছিল। এ দলে ছিলেন অ্যাডামস রিচার্ড হেনরি লি (ভার্জিনিয়া প্রদেশ) এবং জন হ্যানকক।

করেসপন্ডেন্স কমিটি গঠিত হয়। মাস্টার মাইন্ডের বর্ধিত শক্তিই কিন্তু সকল কলোনির মানুষজনকে একত্র করতে পেরেছিল। বিশৃঙ্খল উপনিবেশগুলো সেবারই প্রথম **অর্গানাইজড প্ল্যানিং** এর প্রক্রিয়া শুরু করে।

একতাই শক্তি! কলোনির নাগরিকরা ব্রিটিশ সৈনিকদের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। অনেকটা বোস্টনের দাঙ্গার মতো। তবে তাতে কোনোই লাভ হচ্ছিল না। তাদের একক দুঃখ-দুর্দশা কোনো মাস্টার মাইন্ডের অধীনে সংহত হচ্ছিল না। একক দলের মানুষগুলো কেউই তাদের মন, আত্মা বা শরীর দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে একত্রিত হতে পারছিল না যাতে ব্রিটিশদেরকে হঠানো যায়। এরকমটা চলেছে অ্যাডামস, হ্যানকক এবং লি একত্র

হওয়ার আগ পর্যন্ত।

তবে এদিকে ব্রিটিশরাও কিন্তু অলস বসে নেই। তারাও নিজেদের মতো করে পরিকল্পনা করছিল তাদের অর্থ এবং সংগঠিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে। ব্রিটিশ রাজ গেজকে দায়িত্ব দেন হাচিনসনকে ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর পদ থেকে উচ্ছেদ করার জন্য। নতুন গভর্নরের প্রথম কাজই ছিল স্যামুয়েল অ্যাডামসের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁকে ভয় দেখানো।

তাঁকে ব্রিটিশ রাজের পক্ষ থেকে গভর্নরের দূত কর্নেল ফেটন হুমকি দেন যেন তিনি ব্রিটিশদের আর কোনো বিরোধিতা না করেন। তাহলে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। আর যদি হিজ ম্যাজেস্টির বিরুদ্ধাচারণ না করেন অ্যাডামস, বিনিময়ে তাঁকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। তবে আগে তাঁকে ব্রিটিশ রাজার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে হবে।

অ্যাডামস দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। এ এমন এক সিদ্ধান্ত যাতে তাঁর জীবনও চলে যেতে পারে। বেশিরভাগ মানুষই এরকম পরিস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারত না, তারা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু অ্যাডামস এই বেশিরভাগ লোকের দলভুক্ত ছিলেন না। তিনি কর্নেল ফেন্টনকে বলেন, 'আপনি গভর্নর গেজকে গিয়ে বলুন যে আমি বিশ্বাস করি আমি অনেক আগে থেকেই রাজার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছি। কোনো ব্যক্তিগত বিবেচনা আমাকে আমার দেশ ত্যাগে বাধ্য করতে পারবে না। আর গভর্নর গেজকে গিয়ে বলুন তাঁর জন্য স্যামুয়েল অ্যাডামসের এটাই পরামর্শ যে উত্তেজিত জনতার অনুভূতিকে অপমান করা আর সহ্য করা হবে না।'

গভর্নর গেজ অ্যাডামসের কাছ থেকে এরকম তিক্ত ও বিদ্রুপাত্মক জবাব পেয়ে রেগে কাঁই। তিনি স্যামুয়েল অ্যাডামস এবং জন হ্যানককে উদ্দেশ্য করে একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করেন যাতে পরিষ্কার লেখা ছিল 'হিজ ম্যাজেস্টির নামে আমি প্রস্তাব এবং প্রতিজ্ঞা করছি যে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে যারা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করবে এবং ফিরে যাবে নিজেদের শান্তিময় কর্মকাণ্ডে তবে এ ক্ষমা স্যামুয়েল অ্যাডামস এবং জন হ্যানককের জন্য প্রযোজ্য নয় কারণ তারা যে অপমানকর আচরণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।'

গভর্নরের এই হুমকিতে ওঁরা দু'জন আরেকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হন। তাঁরা দ্রুত একটি গোপন মিটিং ডাকেন। অ্যাডামস সভা কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তালা মেরে চাবিটি পকেটস্থ করে বলেন, কংগ্রেস কোনো সিদ্ধান্ত না

নেয়া পর্যন্ত এ কক্ষ কেউ ত্যাগ করতে পারবেন না।

সভায় নানান হৈ চৈ ও বিতর্ক শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৭৭৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ফিলাডেলফিয়ায় প্রথম কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস মিটিং হবে।

নতুন কংগ্রেসের প্রথম সভার আগে দেশের ভিন্ন একটি অঞ্চলের আরেকজন নেতা 'Summary view of the Rights of British America' প্রকাশের প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির ছিলেন। এই নেতাটির নাম টমাস জেফারসন। ভার্জিনিয়ার নেতা। তাঁর সঙ্গে ভার্জিনিয়ার লর্ড ডানমোরের সম্পর্ক ছিল আদায়-কাঁচকলায়।

টমাস জেফারসনের বিখ্যাত 'Summary of the Rights' প্রকাশের কিছুকাল পরেই জানা যায় তাঁর বিরুদ্ধে হিজ ম্যাজেস্টির সরকার রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনেছেন। এই ভীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে জেফারসনের এক সহকর্মী প্যাট্রিক হেনরি যে সাহসী মন্তব্যটি করেছিলেন তা ম্যাজিকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'এটা যদি রাষ্ট্রদ্রোহ হয় তাহলে এরকম রাষ্ট্রদ্রোহিতা আরো করা উচিত।'

১৭৭৬ সালের ৭ জুন ফার্স্ট কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের মিটিংয়ে রিচার্ড হেনরি লি চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলো বলেন, তাতে গোটা অ্যাসেম্বলি চমকে যায়। তিনি বলেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, আমি বলতে চাই এই ইউনাইটেড কলোনিগুলোর মুক্ত এবং স্বাধীন রাজ্য হিসেবে কাজ করার অধিকার রয়েছে এবং তারা ব্রিটিশ রাজের সমস্ত আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে তাদের কোনোরকম রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকবে না।'

লি'র এই বক্তব্য উত্তপ্তভাবে আলোচিত হতে থাকে এবং শেষে তিনি ধৈর্য হারাতে শুরু করেন। অবশেষে, প্রচুর তর্ক-বিতর্কের পরে তিনি আবার ফ্লোর নেন এবং পরিষ্কার, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমরা এই ইস্যু নিয়ে দিনের পর দিন কথা বলেছি। এখন শুধু একটি বিষয়ই আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে; কেন, স্যার, আমরা এত দেরি করছি? কেন এত কালক্ষেপণ? আজকের এই সুখী দিনটিতে আমেরিকান রিপাবলিকের জন্ম হোক। তাকে আবির্ভূত হতে দিন, সে ধ্বংসাত্মক হবে না বরং শান্তি এবং আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে। ইউরোপ মহাদেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছ। সে দাবি করছে আমরা স্বাধীনতার একটি জীবন্ত উদাহরণ হবো যা জনগণের সুখের জন্য অবিচার ও অরাজকতার বিরুদ্ধে কাজ করবে।'

লি এর পরপরই ভার্জিনিয়া চলে যান তার পরিবারের মানুষজন অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে। তবে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর বন্ধু টমাস জেফারসনের কাছে সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। এর কিছুদিন পরে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হ্যানকক কমিটির চেয়ারম্যান পদে জেফারসনকে অধিষ্ঠিত করেন স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র লিখে দেয়ার জন্য।

কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত এ ডকুমেন্টে যারা সই করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই আসলে নিজেদের মৃত্যু পরোয়ানায় দস্তখত করেছিলেন কারণ গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধে কলোনিগুলো হেরে গেলে এমন দশাই হতো। আর যুদ্ধে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্টই।

ডকুমেন্টটি লেখা হয় ২৮ জুন। মূল ড্রাফটি কংগ্রেসের সামনে পাঠ করা হয়। তারপর কয়েকদিন এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, পরিবর্তন করা হয়েছে এবং শেষে এটি তৈরি হয়েছে। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই টমাস জেফারসন অ্যাসেম্বলির সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভিকচিত্তে ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটির কথা পড়ে শোনান।

জেফারসনের পড়া শেষ হলে ডকুমেন্টটির ওপর ভোটাভুটি হয়, এটিকে গ্রহণ করা হয় এবং এতে ৫৬ জন ব্যক্তি দস্তখত করেন যাঁরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন। তবে ওই সিদ্ধান্তই একটি জাতিসত্তার জন্ম দেয়, পৃথিবীর বুকে জন্ম লাভ করে স্বাধীন আমেরিকা। যে দেশ পরবর্তীতে দুনিয়ার সবগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। 'মাস্টার মাইন্ড' এর ৫৬ জন সদস্যের একটি সিদ্ধান্তই এ ঘটনাটি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। আর তাঁদের এ সিদ্ধান্ত জর্জ ওয়াশিংটনের সৈন্যদের সাফল্য নিশ্চিত করে। কারণ, ওই সিদ্ধান্তের স্পিরিট প্রতিটি সৈনিকের মনে আশার আলো জ্বেলে দেয় এবং এটি আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে কাজ করে বুঝিয়ে দেয় পৃথিবীতে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। সঠিক সিদ্ধান্তই মানুষের জীবনে সাফল্য বয়ে আনে।

–সমাপ্ত–